সেবা
প্রকাশনী
জেরাল্ড ডুরেল
মাতাল অরণ্য
রূপান্তরঃ রকিব হাসান

কিশোর ক্লাসিক

মাতাল অরণ্য

মুলঃ জেরাল্ড ডুরেল

রুপান্তরঃ রকিব হাসান

ডুরেলের বইয়ের কাটতি কোটি কোটি কপি।
ক্লাসিকের তালিকায় ফেলা হয়েছে সেসব বইকে।
তিরিশটিরও বেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।
অসাধারণ একেকটা অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি
পড়তে গিয়ে চেয়ারে বসে উত্তেজনায় পিঠ
সোজা হয়ে যায় কখনও,
কখনও হেসে গড়াগড়ি খেতে হয়,
কখনও বা চোখ কপালে ওঠে বিস্ময়ে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ধাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ধাকা-১১০০

মাতাল অরণ্য

মুলঃ জেরাল্ড ডুরেল

রূপান্তরঃ রকিব হাসান

কৃতজ্ঞতায়ঃ তৌকির কবির তুষার

স্ক্যান ও এডিটঃ ফয়সাল আলী খান

BanglaPDF.net (বাংলাপিডিএফ.নেট)

facebook.com/groups/Banglapdf.net

বাংলাপিডিএফ (BanglaPDF) এর যে কোন রিলিজ করা PDF বই
ইন্টারনেটে কোথাও শেয়ার করা যাবে না।
না কোন ওয়েব সাইটে, ফোরামে, ব্লগে অথবা ফেসবুক গ্রুপে। না অন্য কোন মাধ্যমে।

শেয়ার করতে হলে বাংলাপিডিএফ এর ফোরাম লিঙ্ক শেয়ার করুন ।

পিডিএফ কখনোই মূল বইয়ের বিকল্প হতে পারে না।
যদি এই পিডিএফ বইটি আপনার ভাল লেগে থাকে
তাহলে যত দ্রুত সম্ভব মূল বইটি সংগ্রহ করার অনুরোধ রইল।
পিডিএফ করার উদ্দেশ্য বিরল যে কোন বই সংরক্ষন এবং সবার কাছে পৌঁছে দেয়া।
মূল বই কিনুন। লেখক এবং প্রকাশকদের উৎসাহিত করুন।

মাতাল অরণ্য

জেরাল্ড ডুরেল/রকিব হাসান
প্রথম প্রকাশ:১৯৯৭

জেরাল্ড ডুরেল

চিড়িয়াখানা, এক আজব জায়গা। প্রতিদিন অগণিত দর্শক চিড়িয়াখানা দেখতে যায়, নানা রকম বিচিত্র জীব দেখে আনন্দ পায়, মুগ্ধ, বিস্মিত হয়। অনেকেই জানে না ওগুলো আনতে কি বিপুল আয়োজন, অমানুষিক পরিশ্রম আর বিরাট অঙ্কের অর্থব্যয় হয়েছে। যাঁরা ধরে আনেন তাঁরাও ওই কাজে নিবেদিত, নইলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আনা সম্ভব হত না।

এমনই একজন নিবেদিত প্রাণ মানুষের নাম জেরাল্ড ডুরেল। ১৯২৫ সালে ভারতের জামশেদপুরে জন্মগ্রহণ করেন এই পৃথিবী বিখ্যাত ইংরেজ প্রকৃতিবিদ। ১৯২৮-এ ইংল্যাণ্ডে ফিরে যায় তাঁদের পরিবার। কিন্তু ওখানে ভাল না লাগায় ১৯৩৩ সালে আবার দেশ ছাড়ে, চলে যায় গ্রীসের করফু দ্বীপে।

জানোয়ার গবেষণায় ডুরেলের হাতেখড়ি বলা যায় এই করফুতেই। একটা মজার কথা শোনা যায় তাঁর ব্যাপারে; ছোটবেলায় বাচ্চারা যখন বলতে শেখে বাবা-মা, তখন নাকি তিনি শিখেছিলেন 'চিড়িয়াখানা'। এই একটি শব্দ বলে চিৎকার করতে থাকতেন, সেখানে না নিয়ে গেলে আর শান্ত হতেন না। কিশোর বয়েসে বাড়িতে একটা ছোটখাটো চিড়িয়াখানা বানিয়ে ফেলেছিলেন তিনি। তাঁর সংগ্রহে ছিল সিন্ধুঘোটক, পেঁচা, শুঁয়াপোকা, গেছো-শামুকের মত বিচিত্র সব প্রাণী। এ সবের খোঁজে পুরো দ্বীপে চষে ফিরতেন তিনি, ঘুরে বেড়াতেন সাগর তীরে।

১৯৪৫ সালে বছরখানেক হুইপস্যাড চিড়িয়াখানায় কীপার হিসেবে শিক্ষানবিসী করেছেন ডুরেল। জানোয়ার নিয়ে গবেষণা করেছেন। ১৯৪৭ সালে বেরিয়ে পড়েন জানোয়ার ধরার অভিযানে। এরপর বহুবার বহু জায়গায় গেছেন তিনি; সমস্ত পৃথিবীর জঙ্গল, মরুভূমি, তৃণভূমি, মেরু অঞ্চল চষে বেড়িয়েছেন দুর্লভ প্রাণীর খোঁজে।

১৯৫৪ সালে গঠন করেন জার্সি জুলজিক্যাল পার্ক। বহুদিন ওটার পরিচালক ছিলেন তিনি। ১৯৬৪ সালে গঠন করেন জার্সি ওয়াইল্ডলাইফ প্রিজারভেশন ট্রাস্টের মত বিখ্যাত সংগঠন। বুনো প্রাণীর উন্নতির জন্যে গঠিত এতবড় সংগঠন পৃথিবীতে খুব কমই আছে।

ডুরেলের আরেকটা বড় পরিচয়, তিনি একজন বিখ্যাত লেখক। সত্যি ঘটনা নিয়ে লেখা তাঁর বইয়ের কাটতি কোটি কোটি কপি; ক্লাসিকের তালিকায় ফেলা হয়েছে সেসব বইকে, তিরিশটিরও বেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। অসাধারণ একেকটা অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী। পড়তে গিয়ে চেয়ারে বসে উত্তেজনায় পিঠ সোজা হয়ে যায় কখনও, কখনও হেসে গড়াগড়ি খেতে হয়, কখনও বা চোখ কপালে

ওঠে বিস্ময়ে।

চিড়িয়াখানার জন্যে জানোয়ার ধরতে ডুরেল সর্বপ্রথম গিয়েছিলেন ক্যামেরুনে। 'এ ধরনের অভিযান শুরু করার আগে প্রথমেই তোমাকে জেনে নিতে হবে,' বলেছেন তিনি, 'চিড়িয়াখানা কোন্ প্রাণী চায়। ওসব প্রাণী যে এলাকায় বাস করে সেখানেই যেতে হবে। তোমার ইচ্ছেমত কোথাও যাওয়া চলবে না। একেকটা অভিযানে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয় সেটা খুব কম জুলজিস্ট বা বায়োলজিস্টেরই থাকে। সুতরাং টাকার জন্যে চিড়িয়াখানার কাছে হাত পাততেই হয়।

'আমার প্রথম অভিযানের জন্যে আমি ক্যামেরুনকে বেছে নিয়েছিলাম। বিশাল আফ্রিকার এককোণে এই প্রায় অখ্যাত জায়গাটির প্রতি আকর্ষণ জেগেছিল একটা বিশেষ কারণে, এখানকার বিরাট রেইন ফরেস্ট; হাজার হাজার বছর ধরে টিকে রয়েছে একই ভাবে, কোন পরিবর্তন হয়নি, এখানকার বুনো প্রাণীরাও রয়ে গেছে সেই একই রকম আদিম। বনে ঢুকলে মনে হবে বুঝি লাফ দিয়ে অনেকটা সময় পিছিয়ে গেলাম, ঢুকে পড়লাম সেই কয়েক হাজার বছর আগের এক মাতাল অরণ্যে।

'সভ্যতার ছোঁয়া লাগেনি এই জঙ্গলের *না-মানুষ* আদিবাসীদের মধ্যে। আজও অনেক দুর্লভ জানোয়ারের দেখা মেলে ওখানে। ধরে আনতে পারলে গবেষণা চালানো যাবে, লোকে দেখবে আর বিস্মিত হবে, ভাবতেই রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল শরীর। সুতরাং ওখানে যাওয়ার সুযোগ পাওয়া মাত্র লুফে নিলাম। যত তাড়াতাড়ি পারলাম, তল্পিতল্পা গুছিয়ে রওনা হয়ে গেলাম।'

এক

ব্রিটিশ ক্যামেরুন, জায়গাটার আকৃতি বড় অদ্ভুত, অনেকটা জুতোর বাক্সের মত। লম্বা, চিলতে জমিটা যেন স্যাণ্ডউইচের মাঝখানের পুর, দুপাশে চেপে আছে বনরুটির দুই অংশ নাইজেরিয়া আর ফ্রেঞ্চ ওয়েস্ট আফ্রিকা। অনেক বড় রেইন ফরেস্ট আছে এখানে। বৃষ্টিভেজা এ সব জঙ্গলগুলো যেমন হয়, এটাও তার ব্যতিক্রম নয়, ঘন বাষ্প উঠতে থাকে, এক ধরনের আঠা-আঠা বেজায় গরম।

ওখানে গিয়ে প্রথমেই যে জিনিসটা দৃষ্টি আকর্ষণ করল ডুরেলের, তা হলো চোখ ধাঁধানো রঙ। গাছপালা, ঝোপঝাড়, সব কিছুর রঙই বড় বেশি উজ্জ্বল, সবুজ আর লালের যত রকম শেড আছে, সব আছে এখানে; বটল গ্রীন থেকে শুরু করে গাঢ় সবুজ, কড়া গোলাপী থেকে রক্তলাল, সব আছে। গাছগুলো উঠে গেছে দুশো, তিনশো ফুট ওপরে। কারখানার চিমনির মত মোটা একেকটার বেড়। সেই অনুপাতে বিশাল ডালগুলো পাতা আর পরজীবী লতার ভারে নুয়ে নুয়ে পড়তে চায়।

ক্যামেরুনের ছোট্ট ভিকটোরিয়া বন্দরে নামলেন ডুরেল। দিন সাতেক ওখানে থেকে দেশের গভীরে ঢোকার প্রস্তুতি নিলেন। জন্তু-জানোয়ার ধরা সহজ কাজ নয়, অনেক ঝামেলা, যাওয়ার আগে অনেক কিছুর ব্যবস্থা করে নিতে হয়। কয়েকজন আফ্রিকানকে বাবুর্চি আর হাউস-বয় নিয়োগ করলেন। প্রয়োজনীয় প্রচুর জিনিস কিনলেন দোকান থেকে। জানোয়ার ধরার জন্যে সরকারী অনুমতিপত্রও দরকার। ক্যামেরুনে জন্তু-জানোয়ার শিকারের ওপর আইন খুব কড়া। কোন জানোয়ার বা পাখি শিকার করা বেআইনী। ধরতে হলে বিশেষ অনুমতি নিতে হয়।

এ সব হয়ে যাওয়ার পর এল লরি ভাড়া করার কাজ। তা-ও হলো। খাবার আর দরকারী জিনিসপত্রে বোঝাই করা হলো গাড়ি। আরও নানা টুকিটাকি কাজ। সব জোগাড়-যন্ত্র করে বেরিয়ে পড়লেন দলবল নিয়ে। যেতে হবে দেশের অনেক গভীরে, উপকূল থেকে তিনশো মাইল ভেতরে ক্রস রিভারের ধারে মেমাফ গাঁয়ে।

চলল গাড়ি। ইটের মত লাল মাটি, ঘুরে ঘুরে এঁকেবেঁকে চলে গেছে পাহাড়ী পথ, কোথাও পাহাড়, কোথাও বিশাল বনের ভেতর দিয়ে। গাছে গাছে পাখির ভিড়। উজ্জ্বল তাদের রঙ। ফুল থেকে মধু খাচ্ছে খুদে ঝলমলে রঙের সানবার্ড, ওগুলোর তুলনায় জায়ান্ট ম্যাগপাই পাখিরা ঠুকরে খাচ্ছে বুনো ডুমুর। কিচির মিচিরে কান ঝালাপালা। গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দে মাঝে মাঝেই চমকে গিয়ে উড়াল দিচ্ছে হর্নবিলের ঝাঁক, হুস-হুস করে ডানার বিচিত্র শব্দ তুলে প্রায় মাথা ছুঁয়ে রাস্তা পার হয়ে যাচ্ছে।

পথের পাশে নিচু ঝোপে দেখা মেলে একধরনের গিরগিটির, অনেক আছে, নাম অ্যাগামা লিজার্ড। পাখির মত এগুলোও উজ্জ্বল রঙের। পুরুষগুলোর মাথা

গাঢ় কমলা, শরীরের যত্রতত্র নীল, রূপালী, লাল আর কালোর ছোপ। কোনটা যে তার আসল রঙ বোঝা মুশকিল। মেয়েগুলোর গোলাপী চামড়া, তাতে সবুজ ফুটকি। অদ্ভুত কাণ্ড করে এরা, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ক্রমাগত মাথা তোলে আর নামায়, মনে হয় জাপানী কায়দায় বাউ করছে। ঘন ঘন এ রকম করতে করতে হঠাৎ এক সময় একে অন্যকে তাড়া করে। তারপর আবার থমকে দাঁড়ায়, শুরু হয়ে যায় বাউ করা।

প্রচুর মাছরাঙা দেখা গেল। খুদে, চড়ুই পাখির চেয়ে ছোট এই পাখিগুলোর নাম পিগমি কিংফিশার। রঙের বাহার এদের গায়েও। চকচকে ঘন নীল পিঠ, কমলা বুক, আর টুকটুকে লাল লম্বা ঠোঁট ও পা। বাঁচে পোকা-মাকড় আর ছোট মাছ খেয়ে। টেলিগ্রাফের তারে বসে থাকে, কিংবা কোন মরা ডালের মাথায়। ধ্যানমগ্ন, নিরীহ ভঙ্গি, যেন ভাজা মাছটি উল্টে খতে জানে না। আচমকা ঘোরের মধ্যে যেন গা ছেড়ে দেয়, ভারি পাথরের মত ঝপ করে পড়ে নিচে, বুঝি মরেই গেল। কিন্তু নিচে পড়েই জ্যান্ত হয়ে যায়। দু'একবার ডানা ঝাপটানি, ঠোঁটের খোঁচা, তারপর উড়ে গিয়ে বসে আগের জায়গায়। ঠোঁটে চেপে ধরা প্রায় তারই সমান একটা ফড়িং বা প্রজাপতি।

উপকূল ছাড়ার তিনদিন পরে মেমফিতে পৌঁছলেন ডুরেলরা। হেডকোয়ার্টার করলেন ওই গাঁয়ে। স্থির করলেন, ওখানে থেকে জানোয়ার ধরে বেড়াবেন চারপাশের বন-জঙ্গলে। যত্র-তত্র আস্তানা গাড়লে চলে না। অনেক কিছু দেখেশুনে নিতে হয়। যেমন, কাছাকাছি বাজার বা ভাল দোকানপাট আছে কিনা যেখানে প্রচুর টিনের খাবার বা তাজা খাবার পাওয়া যায়, পেরেক, খাঁচা বানানোর লোহার জাল, আর আরও কিছু জরুরী টুকিটাকি জিনিস পাওয়া যায়। রাস্তাও থাকতে হবে, কারণ জানোয়ার ধরার পর বোঝা অনেক বেশি হয়ে যাবে, রাস্তা না থাকলে সেগুলো বহন করে নিয়ে যাওয়া হবে প্রায় অসম্ভব। আরও দেখতে হবে, আশপাশের জঙ্গলে ধরার উপযোগী প্রচুর জানোয়ার আছে কিনা। ধরতে হলে একা পারা যাবে না, গ্রামবাসীদের সাহায্য দরকার, জেনে নিতে হবে তারা সাহায্য করতে রাজি কিনা। এ সব কিছু বিবেচনা করে মেমফিকে খুবই উপযুক্ত মনে হলো ডুরেলের, কাজেই হেডকোয়ার্টার করতে আর কোন দ্বিধা রইল না। নদীর ধারে ক্যাম্প করলেন তিনি। বিশাল তাঁবু টানানো হলো। পরের ছ'টা মাস এই তাঁবুই হবে তাঁর ঘর।

তাঁবু খাটিয়েই যে কাজ শেষ, জানোয়ার ধরতে বেরিয়ে পড়া যায়, তা নয়। ক্যাম্পটা ঠিকমত হলো কিনা, সেটা আগে ভাল করে দেখে নিতে হবে। কারণ নিজে বাস করলেই তো হবে না, সঙ্গে লোক রয়েছে, তার ওপর যোগ হবে অনেক ধরনের জানোয়ার, সেগুলোকে যাতে সুস্থ রাখা যায় তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। সেগুলোর কোনটার জন্যে খাঁচা, কোনটার জন্যে খোঁয়াড়, কোনটার জন্যে আবার ডোবা দরকার। সে সব তৈরি করে নিতে হবে। কুলি আর চাকরবাকরদের জন্যে দরকার কুঁড়েঘর, বানিয়ে নিতে হবে বাঁশ আর পাতা দিয়ে। তার পরেও আরও আছে। কত জানোয়ার ধরা পড়বে তার কোন ঠিকঠিকানা নেই, দুশো, কিংবা তিনশোও হতে পারে। ওগুলোর জন্যে খাবার আর পানির ব্যবস্থা করতে

হবে। কোন্ কোন্ প্রাণী আছে, সেটা বোঝাও একটা কঠিন ব্যাপার। এর জন্যে আলাপ করতে হবে গ্রামবাসীদের সঙ্গে, তাদেরকে ছবি এঁকে কিংবা ফটোগ্রাফ দেখিয়ে জিজ্ঞেস করতে হবে এই প্রাণী তাদের এলাকায় আছে কিনা, কোথায় আছে, এই সমস্ত। এটা একটা ভীষণ কঠিন কাজ। অনেক সময় না থাকলেও বলে দেয় আছে, একটার ছবি দেখে আরেকটার কথা বলে দেয়। প্রচুর সময় নষ্ট আর খোঁজাখুঁজির পর হয়তো বোঝা যায়, আসলে ওই জানোয়ার ওই এলাকায় নেই।

অনেক পরিশ্রম আর সময় ব্যয়ের পর অবশেষে তৈরি হলো সারি সারি খাঁচা, বড় বড় খোঁয়াড় আর কয়েকটা ডোবা। ইতিমধ্যে গ্রামবাসীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পালাও সাঙ্গ হয়েছে। এবার জানোয়ার ধরতে বেরিয়ে পড়া যায়।

জানোয়ার ধরতে যাওয়ার কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই, যে ভাবেই হোক ধরতে পারলেই হলো। একটা দিকেই কেবল খেয়াল রাখতে হবে, প্রাণীটার যাতে কোন দৈহিক ক্ষতি না হয়। নির্দিষ্ট কোন নিয়ম না থাকলেও কয়েকটা পদ্ধতি অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন ডুরেল, তাঁর মনে হলো, এতে সুবিধে হবে। যেমন, কুকুরের সাহায্যে শিকার ধরা। ক্যামেরুনের এই অঞ্চলের অধিবাসীরা শিকারে বেরোলে কুকুর সঙ্গে নেয়। এমন কোন আহামরি কুকুর নয় ওগুলো, সাধারণ নেড়ি কুত্তা, কিন্তু জঙ্গলে সাংঘাতিক কাজ দেয়। গলায় বাঁধা থাকে কাঠের ছোট্ট ঘণ্টা। ক্রমাগত বাজতে থাকে। ফলে ঘন ঝোপের ভেতর কুকুরগুলো অদৃশ্য হয়ে গেলেও শব্দ শুনে শিকারি বুঝতে পারে কোনদিকে গেছে ওটা, পিছু নিতে পারে অনায়াসে।

কুকুর নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন একদিন ডুরেল। সঙ্গে মানুষ অবশ্যই রইল। চলে এলেন হেডকোয়ার্টার থেকে পঁচিশ মাইল দূরের এনডা আলি পার্বত্য অঞ্চলে। স্থানীয় শিকারিদের মুখে শুনেছেন এখানে পর্বতের ঢালের বনে এক অতি দুর্লভ প্রাণী পাওয়া যায়, যেটা ধরতে তিনি অতিমাত্রায় আগ্রহী। অনেক বড় বেজি, চকলেট রঙের পা, মাখনের মত রঙ শরীরের।

খুব ভোরে রওনা হলেন তিনি। সঙ্গে চলল চারজন স্থানীয় শিকারি এবং পাঁচটা কুকুরের একটা দল। এ ধরনের শিকারে সবচেয়ে বড় অসুবিধে হলো কুকুরগুলোকে বোঝানো যায় না ঠিক কোন জীবটি তিনি চান। বুনো জানোয়ারের সাড়া কিংবা গন্ধ পেলেই ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে যায় ওগুলো, তা সে যাই দেখুক না কেন, এ ক্ষেত্রেও যাবে। বাধ্য হয়ে তাঁকেও তখন ছুটতে হবে কুকুরগুলো কিসের পেছনে লেগেছে দেখার জন্যে। গিয়ে হয়তো দেখা যাবে এমন একটা জীবকে তাড়া করেছে, যেটা তিনি আদৌ চান না। ফিরে আসতে হবে আবার। এভাবে কতবার যে বিফল হতে হবে, তার কোন ঠিকঠিকানা নেই। আন্দাজ করতে পারছেন, কালো-পা বেজির দেখা পাওয়াটা হবে নেহায়েত ভাগ্যের ব্যাপার। তবে এ ছাড়া আর কোন উপায় যখন নেই, এ ভাবেই চেষ্টা চালাতে হবে।

বনের ভেতর দিয়ে আধঘণ্টা মত চলার পর কি একটা জীবের গন্ধ পেয়ে গেল কুকুরগুলো। উত্তেজিত হয়ে ঘেউ ঘেউ করতে করতে ঝোপের ভেতর দিয়ে দৌড় দিল। চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল। কেবল শোনা যেতে লাগল

ওগুলোর ডাক আর গলার ঘণ্টার শব্দ। শিকারিরা ছুটল, পেছনে ছুটলেন ডুরেল। আরও প্রায় আধঘণ্টা ধরে চলল এই পিছু-ছোটা। দূর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে ঘণ্টার শব্দ। কুকুরদের সঙ্গে, তো বটেই, শিকারিদের সঙ্গেও পেরে উঠছেন না ডুরেল। হাঁপিয়ে পড়েছেন। এ সব তো আর অভ্যাস নেই তাঁর। আশা করছেন, কিছুদিনের মধ্যেই অভ্যাসটা হয়ে যাবে, তখন আর কষ্ট হবে না।

ছুটতে ছুটতে আর যখন পারেন না, জিভ বেরিয়ে পড়েছে, এই সময় থমকে দাঁড়াল সামনের শিকারিরা। হাত ধরে একজন তাঁকে আটকে দিল। হাঁ করে জোরে জোরে দম নিতে লাগলেন তিনি। কান খাড়া, ঘণ্টার শব্দ শোনার আশায়।

কিন্তু কোন শব্দ নেই। নীরব হয়ে আছে পুরো বন।

লম্বা হয়ে এক সরলরেখায় দুদিকে ছড়িয়ে পড়লেন তাঁরা। ক্রমশ বাঁকা করতে করতে একসময় রেখাটাকে চক্র তৈরি করে ফেলবেন, ঘিরে ফেলবেন জীবটাকে। তারপর খুঁজে বের করবেন ঠিক কোন জায়গায় আছে কুকুরগুলো।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে ঘোরাঘুরি করার পর তীক্ষ্ণ শিস কানে এল ডুরেলের। ছুটে গেলেন সে দিকে। দেখতে পেলেন দাঁড়িয়ে থাকা শিকারিকে। পানি পড়ার শব্দ কানে আসছে। সে দিকে হাত তুলে ইঙ্গিত করে দৌড় দিল লোকটা। সঙ্গে ছুটলেন ডুরেল। ছুটতে ছুটতেই লোকটা জানাল, নদীর দিকে গেছে কুকুরগুলো। সে জানে, ওগুলোর ঘণ্টা শোনা যাচ্ছে না, পানির শব্দে চাপা পড়ে যাচ্ছে।

পানির কিনারে এসে দেখলেন, ওখানেও নেই কুকুরগুলো। শিকারি অনুমান করল উজানের দিকে গেছে। বেশ খানিকটা উজানে এসে সত্যি পাওয়া গেল ওগুলোকে। বিশ ফুট ওপর থেকে ঝর্না ঝরে পড়ার ফলে একজায়গায় একটা বিরাট গর্ত হয়ে গেছে। অনবরত তাতে ঝরে পড়ছে পানি, তারপর বয়ে যাচ্ছে নদীখাত ধরে। আশেপাশে ছড়িয়ে আছে বিশাল সব পাথরের চাঙড়, শ্যাওলা আর ছোট ছোট উদ্ভিদে ছেয়ে আছে সেগুলো। বড় একটা পাথরের ঘেরের ভেতরে একটা কুকুরের লেজ দেখা গেল। সবগুলোই আছে ভেতরে। পানির শব্দকে ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে ওগুলোর চিৎকার।

কি জিনিসকে আটক করেছে ওরা দেখার জন্যে ভেতরে উঁকি দিলেন ডুরেল। নাহ্, কালো-পা বেজি তো নয়। অতটা আশাও তিনি করেননি। দেখতে পেলেন বিরাট একটা গোসাপ, নাইল মনিটর বলে ওগুলোকে। যেন প্রাগৈতিহাসিক এক সরীসৃপ। চারপাশের আদিম জঙ্গলের সঙ্গে বেশ মানিয়ে গেছে। ছয় ফুট লম্বা জীবটার লেজটা রীতিমত একটা চাবুক। পায়ে আর থাবায় বড়বড় বাঁকানো নখ। চারপাশে পাথর থাকায় বেরোনোর পথ পাচ্ছে না। কুকুরগুলোর দিকে তাকিয়ে পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়াল আক্রমণের ভঙ্গিতে। শাঁই শাঁই করে লেজ দোলাচ্ছে এপাশ ওপাশ, বাড়ি মারার জিনিস খুঁজছে যেন। হাঁ করা মুখ থেকে ফোঁস ফোঁস শব্দ বেরোচ্ছে।

কুকুরগুলোকে ডেকে সরিয়ে আনতে যাবেন ডুরেল, এই সময় বোকামি করে বসল একটা কুকুর। ঝাঁপিয়ে পড়ল গিয়ে গোসাপটার ঘাড়ে। কামড়ে ধরে হিঁচড়ে আনার চেষ্টা করল।

কিন্তু নাইল মনিটরকে চিনতে তখনও বাকি আছে বোকাটার। ঝট করে

কুকুরের একটা কান কামড়ে ধরল ওটা। শরীরটাকে বাঁকিয়ে এনে পেছনের পায়ের নখগুলো কুকুরটার পেটে লাগিয়ে নিচের দিকে মারল হ্যাঁচকা টান। কুকুরটার ভাগ্য ভাল, নখগুলো ঠিকমত বসার আগেই টান মেরেছে গোসাপটা, নইলে পেট চিরে নাড়ীভুঁড়ি বেরিয়ে যেত। ভালমত না লেগেও যা হলো, তাতেও যথেষ্ট। ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠল কুকুরটা। পেটের চামড়া ফেড়ে রক্ত বেরিয়ে এল। গোসাপের ঘাড় ছেড়ে দিয়েছে আগেই, তবে পালিয়ে আসার সুযোগ পেল না। ভয়াল চাবুকের মত লেজের বাড়ি খেয়ে গড়িয়ে এসে পড়ল তার সঙ্গীদের পায়ের কাছে। লড়াইয়ের ইচ্ছে তার একেবারে খতম। লেজ গুটিয়ে কুঁই কুঁই করতে লাগল।

তাড়াতাড়ি কুকুরগুলোকে ডেকে সরিয়ে আনল শিকারিরা। আবার কোন বোকামি করে বসে এই ভয়ে দ্রুত বেঁধে ফেলল একটা গাছের সঙ্গে।

ডুরেলের মনে হলো, ইংল্যাণ্ডের চিড়িয়াখানায় এই গোসাপেরও যথেষ্ট কদর হবে, ধরতে পারলে মন্দ হয় না। কিন্তু কি ভাবে ধরবেন? পাথরের বেড়ায় আটকে হিসহিস করছে আর কাছে গেলে পেট চিরে দেয়ার হুমকি দিচ্ছে জীবটা।

জাল দিয়ে ধরা যেত, কিন্তু পাথরের মধ্যে যেখানে রয়েছে, জাল ফেলতে গেলে পাথরের চোখা মাথায় আটকে যাবে জাল। জীবটার গায়ে পড়বে না। উপায় একটাই আছে, শক্ত দড়ি নিয়ে ওটার মাথার ওপরে পাথরের চূড়ায় উঠে যাওয়া। নিচে থেকে জীবটার দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে রাখতে হবে, সেই সুযোগে ওপর থেকে দড়ির ফাঁস নামিয়ে পরিয়ে দিতে হবে তার গলায়।

কাজটা ডুরেল নিজেই করবেন ঠিক করলেন। শিকারিদের বুঝিয়ে দিলেন কি করতে হবে। সব সময় বৃষ্টিতে ভিজে থাকে বলে এমনিতেই পিচ্ছিল হয়ে আছে পাথর। তার ওপর শ্যাওলা, বেয়ে ওঠা বড় কঠিন। পা পিছলে যায়। কোনমতে উঠে এলেন একটা পাথরের ওপর। ছয় ফুট নিচে গোসাপটা। দড়ির একমাথায় ফাঁস তৈরি করে আস্তে আস্তে নিচে নামিয়ে দিতে লাগলেন।

কুকুর আর নিচের মানুষগুলোর দিকেই নজর গোসাপের। অতি সাধারণ একটা দড়িকে পাত্তাই দিল না। ফলে তার গলায় ফাঁস পরানোটা কঠিন হলো না ডুরেলের জন্যে। কিন্তু পরানোর পর যখন এঁটে বসতে লাগল ফাঁস, তখন টনক নড়ল জীবটার। নরক গুলজার শুরু করল সে।

তাড়াহুড়োয় দড়ির একটা মাথা গাছের সঙ্গে বেঁধে নেয়ার মত সহজ কথাটাও ভুলে গিয়েছিলেন ডুরেল। তার জন্যে যথেষ্ট খেসারত দিতে হলো তাঁকে। ঝুঁকে বসে দড়ি নামিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। যেই গলায় ফাঁস আটকাল, অমনি হ্যাঁচকা টানে ওটাকে আরও শক্ত করে ফেলল গোসাপটা। তারপর তীরের মত সামনের দিকে মারল দৌড়। ডুরেলের পায়ের ফাঁক দিয়ে সড়সড় করে চলে যাচ্ছে দড়িটা। হাতের তালু গেল ছিলে। উপুড় হয়ে পাথরের ওপর পড়ে গেলেন তিনি। পিচ্ছিল, ভেজা, মসৃণ পাথরটায় এমন কোন খাঁজও নেই যে ধরে নিজেকে ঠেকাবেন। টানের চোটে পাথরের ওপর দিয়ে পিছলে সরে এসে ধুড়ুস করে আছড়ে পড়লেন নিচে। কিন্তু এত কিছুর পরেও দড়ি ছাড়লেন না।

গলায় আটকানো ফাঁস এমনিতেই ভড়কে দিয়েছে দানবীয় গিরগিটিটাকে,

তারপর ওপর থেকে জলজ্যান্ত একজন মানুষকে প্রায় গায়ের ওপর পড়তে দেখে দিশেহারা হয়ে গেল। নখ দিয়ে পেট চিরে দেয়ার কথা আর মনে রইল না তার। পালানোর জন্যে অস্থির হয়ে দিল দৌড়। পাথরের বেড়ার খোলা মুখটা দিয়ে বন্দুকের গুলির মত বেরিয়ে গিয়ে দৌড় মারল নদীর দিকে।

হাত থেকে দড়ি ছুটে গেছে ডুরেলের। লাফিয়ে উঠে জাল আনার জন্যে চিৎকার করতে করতে পেছনে দৌড় দিলেন তিনিও।

গলায় দড়ি থাকায় সুবিধে করতে পারল না গোসাপটা। গাছের গোড়ায় পেঁচিয়ে গেল দড়ি। টানাটানি করে খুলে হয়তো নিতে পারত, কিন্তু তার আগেই গায়ের ওপর এসে পড়ল জাল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই অসহায় ভঙ্গিতে কেবল ফোঁস-ফোঁস ছাড়া আর কিছু করার রইল না ওটার।

অনেক কায়দা কসরৎ করে জাল থেকে ওটাকে বের করে পেঁচিয়ে বাঁধা হলো একটা সোজা ডালের সঙ্গে। ডালের দুদিক ধরে তুলে তাকে কাঁধে ঝুলিয়ে নিল দুজন শিকারি।

দুই

সঙ্গে অহেতুক ভারি বোঝা নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর কোন মানে হয় না। গোসাপটাকে নিয়ে দুই শিকারিকে ক্যাম্পে চলে যেতে বললেন ডুরেল। বাকি দুজন শিকারি ও কুকুরগুলোকে নিয়ে আবার ঢুকলেন বনের ভেতরে, যে জীবের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলেন সেই কালো-পা বেজি খোঁজার জন্যে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার কোন একটা জীবের গন্ধ পেয়ে গেল কুকুরগুলো। শুরু হলো পিছু-ছোটা। গোসাপের পিছু নেয়ার চেয়ে অনেক দীর্ঘ হলো এই অনুসরণ। অনেক বেশি কষ্টকর। কারণ, গোসাপটার পিছু নিয়ে ছুটতে হয়েছিল সমভূমির ওপর দিয়ে, এখন নামতে হচ্ছে ঢাল বেয়ে নিচের দিকে। সহজ ঢাল হলেও এককথা ছিল। তা নয়, বড় বেশি এবড়ো-খেবড়ো। তার ওপর যেখানে সেখানে জন্মে আছে নানা রকম ঝোপ, লতা। সবচেয়ে বিপজ্জনক হলো পাথর। আলগা পাথরে পা পড়ে আছাড় খেলে আর দেখতে হবে না, কোমর না ভাঙলেও একটা অন্তত হাঁটু না ভেঙে আর রক্ষা নেই। এ যাত্রা জন্তু-জানোয়ার ধরতে আসার ইতি করতে হবে তাহলে এখানেই।

অনেক কষ্টে নিরাপদে নিচে নামার পর ডুরেল যখন ভাবলেন, যাক, এবার জীবটার দেখা মিলবে ঠিক তখনই ঘেউ ঘেউ করতে করতে আবার আরেকটা পাহাড় বেয়ে উঠতে শুরু করল কুকুরগুলো। শিকারিদের টেনে নিয়ে চলল আরও দুর্গম অঞ্চলের দিকে। হাঁপাতে হাঁপাতে অবস্থা কাহিল হয়ে গেছে ডুরেলের, হৃৎপিণ্ডও যেন রক্ত সরবরাহ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেছে, আর পারে না; ঘামে নেয়ে গেছে শরীর, ওখানেই শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করতে লাগল তাঁর। কিন্তু তারপরেও কুকুরগুলোর থামার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

পৌনে একঘণ্টা এভাবে ছোটার পর যখন ভাবলেন তিনি, চুলোয় যাক জানোয়ার, আগে নিজে তো বাঁচি!—তখন থামল কুকুরের দল। পাহাড় থেকে নেমে মোটামুটি একটা সমতল জায়গায় চলে এসেছেন তাঁরা। ঝড়ে উপড়ানো একটা মরা গাছের কাছে দাঁড়িয়ে ঘেউ ঘেউ করছে কুকুরগুলো। গাঁছটার একজায়গায় একটা খোড়ল। খোড়লটার ঠিক মুখের কাছে বসে আছে একটা সাদা জানোয়ার। মুখটা ভালুকের মত, ছোট ছোঁট কান। বেশ সুন্দর জীব। ভুরু কুঁচকে যেন দেখছে শয়তান কুকুরগুলোকে। গ্যাঁট হয়ে বসে মুখিয়ে আছে। যেন বলতে চাইছে, আয় ব্যাটারা আয়, দেখি কার কত মুরোদ! বাপের নাম ভুলিয়ে ছেড়ে দেব, পাজি, হতচ্ছাড়া, নচ্ছাড়ের দল!

কিন্তু তার সেই আহ্বানে সাড়া দেয়ার মত পৌরুষ কারোরই নেই। কাছে যাচ্ছে না কুকুরগুলো। নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে ঘিরে আছে, আর ঘেউ ঘেউ করছে। একটা কুকুরের নাকে রক্ত দেখেই অনুমান করে নিলেন ডুরেল, খানিকটা দুঃসাহস হয়তো দেখিয়েছিল, তারপর সত্যিই তাকে বাপের নাম ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। তার অবস্থা দেখে বাপের প্রতি শ্রদ্ধাবোধটা যেন অনেক বেড়ে গেছে বাকিগুলোর, নাম ভোলাতে আর যায়নি।

ভীষণ উত্তেজনায় দুরুদুরু করছে ডুরেলের বুক। যে জিনিসের সন্ধানে তিনি এসেছেন, সেটাকেই দেখতে পাচ্ছেন চোখের সামনে।

কালো-পা বেজি!

মানুষ দেখেই সুড়ৎ করে খোড়লে ঢুকে পড়ল বেজিটা।

কুকুরগুলোকে সরিয়ে দিয়ে খোড়লের মুখে জাল বেঁধে দেয়া হলো। ওপথে আর পালাতে পারবে না বেজিটা। বেরোলেই আটকা পড়বে জালে। পুরো গাছটা পরীক্ষা করে দেখা গেল, আর কোন ফুটোফাটা নেই, বেরোনোর পথ নেই। বেরোতে হলে যে দিক দিয়ে ঢুকেছে সে দিক দিয়েই বেরোতে হবে।

কিন্তু সহজে বেরোতে চাইবে না বেজিটা। প্রাণের মায়া কার না আছে? গোলাম হতেও ভাল লাগে না কোন জানোয়ারের; মানুষ হলে অবশ্য আলাদা কথা, কিছু কিছু মানুষ গোলামি করতেই বেশি পছন্দ করে। সুতরাং ধরতে হলে বেরোতে বাধ্য করতে হবে জীবটাকে। কিন্তু কি ভাবে?

বুদ্ধি একটা বেরিয়ে গেল। অনেক দিন ধরে বনতলে পড়ে থেকে থেকে পচে নরম হয়ে গেছে কাঠ। ছুরি আর হাতকুড়াল দিয়ে কুপিয়ে খোড়লের কাছ থেকে খানিকটা দূরে একটা ছোট ছিদ্র করা হলো। গাছের ভেতরে যে সুড়ঙ্গে লুকিয়েছে বেজিটা, তার সঙ্গে যুক্ত হলো এই ছিদ্র। ফুটোটা এত সরু, এ পথে বেরোতে পারবে না বিরাট বেজি। ওই ছিদ্র দিয়ে তখন ধোঁয়া ঢোকানোর ব্যবস্থা হলো।

গলগল করে ঘন ধোঁয়া ঢুকতে লাগল খোড়লে। একধরনের কাঁচা পাতা আগুনে ফেলে দিল শিকারিরা। তীব্র ঝাঁঝাল হয়ে উঠল ধোঁয়া, চোখে লাগলেই জ্বালা করে, গলায় ঢুকলে শুরু হয় কাশি। বদ্ধ জায়গায় থেকে ধোঁয়ার এই অত্যাচার বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারল না বেচারা কালো-পা বেজি। ভেতর থেকে তার বিচিত্র কাশির শব্দ শোনা যেতে লাগল। অস্থির হয়ে ছোটাছুটি করতে লাগল। শেষে তীব্র গতিতে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল খোড়লের মুখের জাল ছিঁড়ে।

কিন্তু খুব শক্ত সুতোর তৈরি জাল, তার পক্ষে ছেঁড়া সম্ভব হলো না। ঢিল করে, অনেকটা থলের মত করে বাঁধা হয়েছে ওটা। ছুটে বেরোতে গিয়ে তাতে ঢুকে পড়ল জানোয়ারটা। জড়িয়ে গেল জালে। কামড়ে ছেঁড়ার চেষ্টা চালাল প্রাণপণে। কিঁচকিঁচ করে ধমক মারতে লাগল। কাছে গেলে কামড়ে আঙুল আলাদা করে দেয়ার হুমকি দিল।

কিন্তু কোন হুমকিতেই কোন কাজ হলো না। মানুষ তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী আর বুদ্ধিমান। মুক্তি পাওয়া তার হলো না বটে, তবে চেষ্টার কোন ত্রুটি করল না। তিনজনের আঙুলেই তার দাঁতের চিহ্ন রেখে দিল। রক্তাক্ত করে দিল হাতের তালু।

একদিনে অনেক হয়েছে। অন্য কোন জানোয়ার ধরতে যাওয়ার ইচ্ছে বা সামর্থ্য কোনটাই রইল না আর সেদিন। ক্যাম্পে ফেরার নির্দেশ দিলেন তিনি। আনন্দে ভরপুর মন কষ্ট অনেক করেছেন বটে, লাভও হয়েছে। যে জিনিসের জন্যে বেরিয়েছিলেন, সেটা তো পেয়েছেনই, বাড়তি বোনাস হিসেবে পেয়েছেন এক আদিম ডাইনোসরের বংশধরকে।

ক্যাম্পে এসে খাঁচায় ভরা হলো বেজিটাকে।

সমস্যা দেখা দিল তাকে খাওয়ানো নিয়ে। খাওয়া তো দূরের কথা, ডুরেল কিংবা অন্য কাউকে কাছাকাছি হতে দেখলেই এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে খাঁচার দরজায়, শিক কামড়ে কেটে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে। বেরোতে পারলে পালানোর আগে যে একটা উচিত শিক্ষা দিয়ে নেবে দু'পেয়ে শয়তান মানুষকে, সেই ভঙ্গিও তার চেহারায় স্পষ্ট।

তবে এ ক্ষেত্রেও মানুষের বুদ্ধি আর ধৈর্যের কাছে হার মানতে হলো তাকে। ঠিক দুই সপ্তাহের মাথায় এতটাই পোষা হয়ে গেল, ডুরেলের হাত থেকে নিয়ে খাবার খেতেও আর আপত্তি করল না।

তিন

ক্যামেরুনের পার্বত্য অঞ্চলে পর্বতের ঢাল বেয়ে নেমে আসা ঘন বনের কিনার থেকে ছড়িয়ে পড়েছে এক বিশাল তৃণভূমি। বড় বড় ঘাস এখানে, মাঝে মাঝে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কিছু ঝোপঝাড় ছাড়া গাছপালা তেমন নেই। জাল দিয়ে এখানে জানোয়ার ধরার সিদ্ধান্ত নিলেন ডুরেল। একটা বিশেষ জানোয়ারের ওপর নজর পড়ল তাঁর, ঘণ্টা-বাজানো কাঠবিড়ালী। গলা ফুলিয়ে অদ্ভুত এক ধরনের আওয়াজ করে এই প্রাণীগুলো, অনেকটা ঘণ্টার শব্দের মত, দূর থেকে মনে হয় ঘণ্টা বাজছে।

অনেক বড় হয় এরা, সাধারণ কাঠবিড়ালীর দ্বিগুণ। পর্বতের নিচের উপত্যকায়ও দেখা মেলে এদের, তবে ওখানে বড় বড় গাছে চড়ে বসে থাকে বলে ধরা প্রায় অসম্ভব। গাছের ডালে ডালে ঘোরে, ফল আর বাদাম খায়, নিচে প্রায়

নামেই না। পর্বতের ঢালের ঘাসবনে বনের কিনারের ছোট আর নিচু গাছগুলোতে বাস করে এই কাঠবিড়ালী, সকাল-বিকাল দলে দলে মাঠে নামে খাবার খোঁজার জন্যে। তখনই সুযোগ, চেষ্টা করলে ধরা যেতে পারে।

কাঠবিড়ালী ধরার জন্যে একদিন রাত একটা সময় দল বেঁধে তৈরি হয়ে ক্যাম্প থেকে বেরোলেন ডুরেল। পর্বতে রওনা হলেন। ভোরের আলো ফোটার আগেই পৌঁছলেন সেখানে। বনের কিনারে তৃণভূমিতে একটা উপযুক্ত জায়গা বাছাই করে তিনদিক ঘিরে জাল পাতা হলো। ঢেকে দেয়া হলো ডালপাতা আর ঘাস দিয়ে। অন্ধকারে সারতে হলো কাজটা, নীরবে, যাতে কাঠবিড়ালীরা কিছু সন্দেহ করতে না পারে, না জানতে পারে এখানে মানুষের আগমন ঘটেছে। তাহলে সতর্ক হয়ে যাবে, আর আসতে চাইবে না।

জাল পেতে রেখে বনের কিনারের কয়েকটা বড় বড় ঝোপে গিয়ে লুকিয়ে রইলেন তাঁরা। শিশির পড়ে ভিজে আছে পাতা, ভিজিয়ে দিল তাঁদেরকেও। কাপড় ভিজে যাওয়ায় শীত করতে লাগল। পার্বত্য অঞ্চলে ঠাণ্ডা এমনিতেই বেশি, কিছুক্ষণের মধ্যেই হি-হি করে কাঁপতে লাগলেন ডুরেল। খালি মনে হতে লাগল কখন সকাল হবে আর সূর্য উঠবে। বহু যুগ পার করে দিয়ে উঠল যখন সূর্য, দাঁতে দাঁতে বাড়ি খাচ্ছে ডুরেলের, অবশ হয়ে গেছে হাত-পা।

রোদ বাড়ল। শিশির-কণা বাষ্প হয়ে গিয়ে হালকা ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মত পাক খেয়ে উড়তে লাগল। এই সময় শোনা গেল খুব জোরাল একটা বিচিত্র চাক-চাক শব্দ, পর্বতের ঢালে, গাছে গাছে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরতে লাগল। ডুরেলের পাশে বসা এক শিকারি ফিসফিসিয়ে বলল, ঘাসবনে নাস্তা করার জন্যে নেমে আসছে কাঠবিড়ালীরা।

নড়েচড়ে বসলেন ডুরেল। চোখের সামনের পাতা সরিয়ে তাকালেন বনের দিকে। চোখে পড়ল ঘাস যেখানে শুরু হয়েছে সেখানে লম্বা সাদা-কালো একটা বেলুনের মত কি যেন একবার উঠছে একবার নামছে। জিনিসটা কি বুঝতে পারলেন না তিনি। পাশে বসা শিকারিকে দেখাতে সে বলল ওটা কাঠবিড়ালীর লেজ, ঘাসের মধ্যে শরীর লুকিয়ে রেখেছে বলে শুধু লেজটাকে ওরকম লাগছে দেখতে।

দেখতে দেখতে প্রথম 'বেলুনটার' সঙ্গে এসে যোগ দিল আরও অনেকগুলো বেলুন। রোদ আরেকটু বাড়লে এক জায়গায় বসে না থেকে ঘাসবনে ঢুকে এগোতে শুরু করল কাঠবিড়ালীগুলো। কয়েক পা এগোয়, লেজের ওপর ভর দিয়ে বসে সাবধানে তাকায় এদিক ওদিক, আবার চলে; এরকম করে করে এগিয়ে যেতে লাগল জালের দিকে।

গাছের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেল ওগুলো। ডুরেল ভাবলেন, এখনই সময়। তাড়া করলে গাছের কাছে যেতে বেশ সময় লাগবে ওদের, ততক্ষণে ধরে ফেলা যাবে। শিকারিদেরকে আগেই বলা ছিল কিভাবে কি করতে হবে। লাফ দিয়ে বেরিয়ে এসে যেদিকটায় জাল নেই, সেদিকে একসারিতে দাঁড়িয়ে গেল সবাই।

গাছে বসা কাঠবিড়ালীগুলো দেখতে পেল প্রথমে, সমস্বরে তীক্ষ্ণ চিৎকার শুরু

করল ওরা। ফেটে পড়ল যেন সমস্ত বন। ঘাসবনের কাঠবিড়ালীগুলো এই ডাকাডাকিতে চমকে গেল। ফিরে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করল কি দেখে অমন চিৎকার শুরু করেছে ওদের সঙ্গীরা।

ডুরেলদের প্ল্যান হলো একসারিতে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে যাবেন জালের দিকে, কাঠবিড়ালীগুলোকে সরিয়ে নেবেন গাছপালা থেকে যতটা সম্ভব দূরে। জালের কাছাকাছি গিয়ে হঠাৎ করে ছুট লাগাবেন, ভয় দেখিয়ে জানোয়ারগুলোকে দিশেহারা করে নিয়ে গিয়ে ফেলবেন জালের ওপর, ধরে ফেলতে আর অসুবিধে হবে না তখন।

ঠিকমতই ঘটে যেত সব, কিন্তু একটা কাঠবিড়ালী বাকিগুলোর চেয়ে চালাক। ওটা বুঝে ফেলল, গাছ থেকে ওদেরকে দূরে সরিয়ে নেয়া হচ্ছে। আচমকা ঘুরে বাঁয়ে কেটে শিকারিদের পাশ কাটিয়ে সুড়ৎ করে গিয়ে বনে ঢুকে পড়ল। ব্যাপারটা লক্ষ করল অন্য কাঠবিড়ালীগুলো। লেজের ওপর বসে পড়ে দ্বিধা করতে লাগল, কোন দিকে যাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। জালের ঘেরের মধ্যে পুরোপুরি প্রবেশ করেনি এখনও ওরা, কিন্তু আর দেরি করা ঠিক হবে না, ভাবলেন ডুরেল; তাহলে বাকি কাঠবিড়ালীগুলোও আগেরটার পথ অনুসরণ করতে পারে। সবাইকে একসঙ্গে দৌড় দিতে বললেন তিনি।

চিৎকার আর হাততালি দিয়ে, হই-চই করে কাঠবিড়ালীগুলোকে যতটা সম্ভব ভয় দেখানোর চেষ্টা করতে করতে ছুটল শিকারিরা। গাছের দিকে যাওয়ার সাহস করতে পারল না আর ওগুলো, ঘুরে ছুট লাগাল জালের দিকে। দুটো কাঠবিড়ালী হঠাৎ দু'দিকে সরে গিয়ে আবার উল্টো দিকে ঘুরে বনের দিকে ছুটল। তিনটে গিয়ে জালের মধ্যে আছড়ে পড়ল। আটকে গেল দড়ির খোপে। ছাড়া পাওয়ার জন্যে ছটফট শুরু করল।

জাল থেকে ওদের ছাড়ানোটাও সহজ হলো না। গলা ফাটিয়ে অবিরাম চিৎকার করতে লাগল। ধরতে গেলেই কমলা রঙের দাঁত বের করে খ্যাঁচ করে কামড়ে দিতে আসে। বেশ সুন্দর দেখতে প্রাণীগুলো। লালচে পিঠ, হলুদ পেট, সাদা-কালো আঙটি আঁকা ফোলা লেজ। আঠারো ইঞ্চি লম্বা একেকটা।

বনের কাঠবিড়ালীরা তখন ভাল করেই জেনে গেছে ওদেরকে ধরতে এসেছে মানুষ। বুঝে গেছে, ঘাসবন এখন ওদের জন্যে মোটেও নিরাপদ নয়। নামা দূরে থাক, গাছের যতটা সম্ভব ওপরে উঠে গেল ওরা। একনাগাড়ে চাক-চাক চাক-চাক করে ডেকে চলল। আর এখানে থেকে লাভ নেই, বুঝতে পারলেন ডুরেল। একটা কাঠবিড়ালীও আর নামবে না এখন গাছ থেকে। যে তিনটেকে পাওয়া গেছে সেগুলোকেই ধরে মোটা ক্যানভাসের ব্যাগে ভরে ক্যাম্পে ফিরে চললেন আবার দলবল নিয়ে। তাঁবুতে পৌঁছে জালের খাঁচায় ওগুলোকে ঢুকিয়ে দিয়ে প্রচুর ফল আর শাকসব্জি রেখে দিলেন খাওয়ার জন্যে।

পরদিন খুব ভোরে আবিষ্কার করলেন তিনি, কেন ওরকম বিচিত্র নাম দেয়া হয়েছে কাঠবিড়ালীগুলোর। খুব ভোরে একটা অদ্ভুত শব্দে ঘুম ভেঙে গেল তাঁর। কাঠবিড়ালীর খাঁচার কাছ থেকে আসছে। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে দেখতে গেলেন। টেলিগ্রাফের তারে এলোমেলো ঝোড়ো বাতাস লাগলে যেরকম শব্দ হয়, শব্দটার

শুরু তেমনিভাবে। আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে, জোরাল হয়, শেষ হয় স্কুলের ঘণ্টা পেটানোর শব্দের রেশ মিলিয়ে যাওয়ার মত করে।

এরপর প্রতি ভোরেই কাঠবিড়ালীর ঘণ্টা শুনে ঘুম ভাঙতে লাগল তাঁর। প্রথম প্রথম খারাপ লাগত, তারপর সয়ে গেল। প্রাকৃতিক ওই অ্যালার্ম একটা নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমটা যদি ভাঙিয়েই দেয়, অসুবিধে কি। তাড়াতাড়ি উঠে কাজে লাগতে পারবেন, বেশি করে কাজ করতে পারবেন আরও।

চার

বনে-বাদাড়ে ঘোরাঘুরি করে শুধু যে বিচিত্র জানোয়ার দেখেছেন ডুরেল, তা নয়, বিচিত্র কিছু মানুষেরও সন্ধান পেয়েছেন, যারা এতটাই বিস্মিত করেছে তাঁকে, নাম দিয়ে ফেলেছেন হিউম্যান-অ্যানিম্যাল বা মানব-জন্তু। সেরকম একজন মানুষ, ম্যাকটুটল।

বেশির ভাগ মানুষের কাছেই জঙ্গল মানে ভয়ানক জায়গা, সাপ আর বাঘের রাজত্ব, ঢুকলে প্রাণ হাতে করে ঢুকতে হবে, ম্যাকটুটলও তাদের দলে। ডুরেলের সঙ্গে জাহাজে পরিচয়। দুজনেই পশ্চিম আফ্রিকায় চলেছেন। ম্যাকটুটলের বাড়ি আয়ারল্যাণ্ডে, ক্যামেরুনে কলার চাষ করতে যাচ্ছে। এর আগে ইংল্যাণ্ডের বাইরে আর কোথাও পা রাখেনি। তার ধারণা আফ্রিকা হলো এক অতি ভয়ঙ্কর জায়গা। এত বিষাক্ত সাপের আড্ডা যে জেটিতে ভেড়ামাত্র শত শত সাপ কিলবিল করে জাহাজে উঠতে শুরু করবে। ডুরেল তাকে বোঝালেন, এ সব ভুল শুনেছে সে। আট মাস রেইন ফরেস্টের মত ঘন জঙ্গলে কাটিয়ে এসেছেন, সর্বসাকুল্যে মাত্র পাঁচটা সাপ চোখে পড়েছে তাঁর এবং সেসব সাপ তাঁকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে এত দ্রুত ছুটে পালিয়েছে যে কাছেও যেতে পারেননি। একটাকেও ধরতে না পারায় বরং আফসোসই হচ্ছে তাঁর। সে জানতে চাইল সাপ ধরা কি বিপজ্জনক? ডুরেল জবাব দিলেন সাপের স্বভাব-চরিত্র জানা থাকলে আর সাপ সম্পর্কে ধারণা থাকলে বেশির ভাগ সাপ ধরাই একেবারে সহজ।

শুনে অনেকটা আশ্বস্ত হলো ম্যাকটুটল। ডুরেলকে কথা দিল, তিনি ইংল্যাণ্ডে ফেরার আগে বেশ কিছু দুর্লভ জাতের সাপ তাঁকে জোগাড় করে দেয়ার ব্যবস্থা করবে সে। তাকে ধন্যবাদ দিলেন ডুরেল; এবং দ্রুত ভুলে গেলেন এই প্রতিজ্ঞার কথা।

পাঁচ মাস পর, বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছেন ডুরেল, সঙ্গে প্রায় দুশো প্রজাতির জন্তু-জানোয়ার। রাত প্রায় বারোটা বাজে। পরদিন ভোরে জাহাজ ছাড়বে। সময়মত উঠতে হলে শুয়ে পড়া দরকার। এই সময় ক্যাম্পের বাইরে এসে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল একটা ছোট ভ্যানগাড়ি। কয়েকজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে নেমে এল ম্যাকটুটল। হাসিমুখে জানাল, প্রতিজ্ঞার কথা ভোলেনি সে। কলা চাষের জন্যে জঙ্গল কাটতে গিয়ে একটা গর্ত আবিষ্কার করেছে তার লোকেরা,

সাপে ভর্তি। যেহেতু তার জায়গায় বাসা করে আছে সাপগুলো, আইনত ওগুলোর মালিকও সে, সব উপহার দিয়ে দিতে চায় ডুরেলকে। তবে সেগুলো ধরে আনতে হবে তাঁকে।

এতগুলো দুর্লভ সাপ উপহার দেয়ার আনন্দে এতটাই মশগুল হয়ে আছে সে, 'যেতে পারবেন না' বলে তাকে দুঃখ দিতে পারলেন না ডুরেল। কিছুতেই বলতে পারলেন না রাত দুপুরে গুহায় নেমে একগাদা সাপের মধ্যে থেকে সাপ ধরে আনার চেষ্টা করাটা স্রেফ পাগলামি। তাকে দোষও দিতে পারলেন না। একটা সাপও ধরতে পারেননি বলে আফসোস করাতেই না সে তাঁকে কথা দিয়েছিল সাপ উপহার দেবে। তার ওপর বন্ধুদের কাছে বড়মুখ করে তাঁর সাহসের কথা বলে হাতেনাতে প্রমাণ দেখানোর জন্যে নিয়ে এসেছে। কি করে ফেরান?

অনেক দোমনা করে একটা ক্যানভাসের থলে আর একটা সাপ ধরার লাঠি নিয়ে তৈরি হলেন তিনি। লাঠির এক মাথায় পিতলের তৈরি একটা Y-এর মত কাঁটা বসানো, ওটা দিয়ে সাপের ঘাড় চেপে ধরতে হয়। গাড়িতে গাদাগাদি করে বসলেন। সাড়ে বারোটায় ম্যাকটুটলের বাংলোয় পৌঁছলেন।

এককাপ কফি না খাইয়ে ছাড়ল না ম্যাকটুটল। জিজ্ঞেস করল, 'নিশ্চয় দড়ি লাগবে আপনার?'

'দড়ি? কেন?'

'গর্তে নামার জন্যে।'

অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন ডুরেল। গর্তটা কতবড় জানতে চাইলেন। জানা গেল পঁচিশ ফুট লম্বা, চার ফুট চওড়া আর বারো ফুট গভীর। সবাই পরামর্শ দিতে লাগল, দড়ি ছাড়া ওই গর্তে নামার চেষ্টা করা উচিত হবে না তাঁর।

দড়ি আনতে চলে গেল ম্যাকটুটল। মনে মনে নিজের বোকামির জন্যে নিজেকে গালমন্দ করতে লাগলেন ডুরেল, মনেপ্রাণে আশা করলেন, দড়িটা খুঁজে না পেলে ভাল হয়। গাছের ডাল, মাটি কিংবা ছোট কোন গর্ত থেকে সাপ ধরা আলাদা কথা, কিন্তু দড়ি ছাড়া নামা যায় না এমন এক সাপবোঝাই গর্তে রাত দুপুরে নামার কথা ভাবতে গিয়ে গলা শুকিয়ে গেল তাঁর। আরেক কাপ কফি ঢেলে নিলেন কাপে। কি করে না নেমে পারা যায় সেই উপায় খুঁজতে লাগলেন মনে মনে।

দড়ি নিয়ে এল ম্যাকটুটল। ডুরেল বললেন, আলো লাগবে। সঙ্গে করে টর্চ আনেননি, ভাবলেন গর্তের মধ্যে আলোর ব্যবস্থাও করতে পারবে না ম্যাকটুটল; তিনিও না নামার একটা ছুতো পেয়ে যাবেন। কিন্তু এতখানি এগোনোর পর কোন বাধাই আর নিরস্ত করতে পারল না ম্যাকটুটল বা তার সঙ্গীদেরকে। সাপ-ধরা দেখার মত এতবড় একটা সুযোগ কোন কারণেই মিস করবে না ওরা।

আলোর ব্যবস্থা করে ফেলল ম্যাকটুটল। একটা প্যারাফিন প্রেশার-ল্যাম্পের এক মাথায় দড়ি বেঁধে সেটা গর্তে নামিয়ে দেয়া হবে, দরকার হলে ডুরেলকে সাহায্যের কাজটা নিজের হাতে করবে সে। বলল, 'এই ল্যাম্পের আলো টর্চের চেয়ে অনেক জোরাল। একটা সাপও আপনার চোখকে ফাঁকি দিয়ে বাঁচতে পারবে না।'

শুকনো গলায় ওকে ধন্যবাদ দিলেন ডুরেল।

'না না, এর জন্যে আবার ধন্যবাদ কেন,' আন্তরিক কণ্ঠে বলল ম্যাকটুটল। 'আপনি যে আনন্দ পাচ্ছেন এতেই আমি খুশি। তবে একটু দেরি করতে হবে আপনাকে। আমার ভাই আর ভাবী খবর পেয়েছে, ওরাও আসছে দেখার জন্যে। যাকে পাঠিয়েছিলাম তার কাছে বার বার বলে দিয়েছে ওরা আসার আগে কোনমতেই যেন আপনি না নামেন, সাপ ধরা দেখার এমন অপূর্ব সুযোগ আর কখনও পাবে না তো, তাই মজাটা মিস করতে চায় না।'

অবশেষে হাজির হলো তারা। আটজনের দলটা হই-হট্টগোল করতে করতে এগোল অন্ধকার কলাবাগানের ভেতর দিয়ে। হিসেবটা বোধহয় একটু ভুল হলো, আনন্দ করছে আসলে সাতজন, একজন একেবারে চুপ, তিনি ডুরেল। বুক কাঁপছে তাঁর। তাড়াহুড়োয় আরও বোকামি করেছেন, পরে এসেছেন পাতলা কাপড়ের পায়জামা আর রবারের জুতো, যে কোন ছোট জাতের সাপের দাঁতও এগুলো ভেদ করে মাংসে ঢুকে যাবে অনায়াসে। সেটা ম্যাকটুটলকে বলবেন কিনা ভাবতে ভাবতেই পৌঁছে গেলেন গর্তের কাছে।

কথা রাখল ম্যাকটুটল, নিজের হাতেই ল্যাম্পটা নামিয়ে দিল নিচে। গর্তের কিনারে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ল্যাম্পের আলোয় সেটার দিকে তাকিয়ে ডুরেলের মনে হতে লাগল বিরাট এক কবরের দিকে তাকিয়ে আছেন। গর্তের বর্ণনা ঠিকই দিয়েছে ম্যাকটুটল, তবে একটু ভুল করেছে, কিংবা হিসেবের মধ্যেই আনেনি, তা হলো ওটার মেঝের আর দেয়ালের অসংখ্য ছোট ছোট গর্ত। সাপগুলোর দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠলেন। গ্যাবুন ভাইপার, পৃথিবীর সবচেয়ে বিষাক্ত সাপের একটি। মেঝেতে কিলবিল করছে ওগুলো, দৃশ্যটাই ভয়ঙ্কর।

দিনের বেলায় নড়াচড়া কম করে এই সাপ, তখন ধরাটা অত কঠিন নয়, কিন্তু রাতের বেলা শিকার ধরার স্বভাব বলে পূর্ণ সজাগ হয়ে ওঠে, বাধা দেখলেই ফোঁস করে উঠে ছোবল মারে গর্তের সাপগুলো অল্প বয়েসী বলে আক্রমণাত্মক বেশি, বড়দের চেয়ে অনেক বেশি বিপজ্জনক। এঁকেবেঁকে হাঁটছে, গড়াচ্ছে, একে অন্যের গায়ের ওপর উঠে কিলবিল করছে, থেকে থেকে শীষের ফলার মত দেখতে ভারি মাথা তুলে ল্যাম্পের দিকে তাকিয়ে ফোঁস-ফোঁস করছে, চেরা জিভ বের করে ছোবল মারার হুমকি দিচ্ছে।

মেঝেতে আছে আটটা সাপ, আশপাশের গর্তগুলোতে যে আরও আছে একটা সাপের মাথা বেরিয়ে আসতে দেখে সেটা বোঝা গেল।

ম্যাকটুটলের পায়ের চাপে গর্তের কিনার থেকে একটুকরো মাটি ভেঙে পড়ল। মুহূর্তে ফণা তুলে ফুঁসতে শুরু করল সাপগুলো। ঝটকা দিয়ে গর্তের কিনার থেকে পিছিয়ে গেল দর্শকরা, যেন লাফ দিয়ে নিচ থেকে উঠে আসবে সাপ, কামড়ে দেবে ওদের পায়ে পরনের কাপড় নিচে নামার উপযুক্ত নয়, কথাটা বলার এইই সুযোগ, ভাবলেন ডুরেল।

বলার সঙ্গে সঙ্গে নিজের পরনের ভারি টুইলের প্যান্ট আর চামড়ার জুতো খুলে দিতে রাজি হয়ে গেল ম্যাকটুটল। শেষ ফন্দিটাও কাজে লাগল না ডুরেলের। কোন ছুতো করেই গর্তে নামা ঠেকাতে পারলেন না। একটা ঝোপের আড়ালে

গিয়ে জামা-কাপড় বদলে এলেন দুজনে। প্যান্টটা বড় আর ঢলঢলে হলো ডুরেলের পরনে। জুতোও এক সাইজ বড়। ম্যাকটুটল বলল, ভালই হলো। নিচের বাড়তি অংশ জুতোর ভেতরে ঢুকিয়ে নিলে গোড়ালি ঢেকে গিয়ে নিরাপত্তা বাড়বে।

এরপর আর কি বলার থাকে? মুখ কালো করে গর্তের দিকে এগোলেন ডুরেল। বাকি সবার মুখ উজ্জ্বল, অনর্গল বকবক করছে, দারুণ এক মজা দেখার আনন্দে অধীর। নিজের কোমরে দড়ি বাঁধলেন ডুরেল, পেঁচিয়ে না বেঁধে ফাঁস পরালেন। ভুলটা টের পেলেন খানিক পর, যখন দড়ি ধরে তাঁকে ঝুলিয়ে নামানো হতে লাগল। ক্রমশ কোমরে এঁটে বসতে লাগল দড়ি, দম নিতে কষ্ট হচ্ছে। ওপর থেকে রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে আছে দর্শকরা, পায়ের চাপে মাটি ভেঙে পড়ছে, পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফোঁস করে ফণা তুলছে সাপগুলো। দু'একটা ছোবলও মারছে মাটির ঢেলায়।

মেঝে থেকে ফুটখানেক ওপরে থাকতে চিৎকার করে দড়ি ছাড়া থামাতে বললেন ডুরেল, দেখে নিতে চান পায়ের নিচে কোন সাপ পড়ছে কিনা।

ভাল করে তাকিয়ে দেখলেন। নেই। আবার দড়ি ছাড়তে বললেন। ঠিক এই সময় ঘটল অঘটন। একটা পায়ের পাতা সামান্য নিচু করেছিলেন, জুতোটা খসে পড়ে গেল মাটিতে। পরমুহূর্তে আরেক বিপদ। গর্তে নামানোর আগে ল্যাম্পে পাম্প করার কথা মনে ছিল না ম্যাকটুটলের, পাম্প ফুরিয়ে গিয়ে নিভে গেল সেটা, সিগারেটের আগুনের জ্বলন্ত মাথার মত লাল হয়ে জ্বলে রইল। মাটি স্পর্শ করেছে ডুরেলের পা। বুকের খাঁচায় লাফালাফি করছে হৃৎপিণ্ডটা। এত ভয় আর জীবনে পাননি তিনি। পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। দরদর করে ঘামছেন।

দড়ি ধরে তাড়াতাড়ি ল্যাম্পটা তুলে নিল ম্যাকটুটল। পাম্প করে আবার নামিয়ে দিল। আলো দেখে এতটা খুশিও আর কখনও হননি ডুরেল। আবার উজ্জ্বল আলোর বন্যায় ভেসে গেল গর্তটা। সাপগুলোর দিকে চোখ রেখে আস্তে করে নিচু হয়ে জুতোটা তুলে পায়ে গলালেন। ঘামে ভিজে গেছে হাতের তালু। শক্ত করে চেপে ধরলেন লাঠিটা। সাবধানে খোঁচা মেরে সবচেয়ে কাছের সাপটার ঘাড় চেপে ধরলেন। এখন আরেক হাতে ওটার মাথা টিপে ধরে ব্যাগে ভরে ফেললেই হলো। একটা হলে এটা কোন ব্যাপারই ছিল না তাঁর কাছে। ধরার সময় যেটাকে ধরা হয়েছে সেটার দিকে পুরো মনোযোগ দিতে হয় বলে আশেপাশে কিলবিল করতে থাকা বাকি সাপগুলোর দিকে নজর দেয়া কঠিন, কোনটা যে কি করে বসবে বলা মুশকিল, বিপদটা এখানেই। বাদামী, রূপালী, লাল আর মাখন রঙের নকশা কাটা এই সাপগুলো যখন একটার সঙ্গে আরেকটা পেঁচিয়ে গিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে কোনটা যে কোনটার মাথা আর কোনটার লেজ দিনের বেলায়ই বোঝা কঠিন, আর এখন তো রাত। ল্যাম্পের আলোয় আলাদা করে চেনা প্রায় অসম্ভব। সমস্যা আরও আছে। যেই একটাকে লাঠি দিয়ে চেপে ধরেন, কেটলির ফুটন্ত পানির মত ফুঁসে ওঠে ওটা। বাকিগুলোও উত্তেজিত হয়ে একই ভাবে ফুঁসতে শুরু করে।

প্রথম সাপটাকে তোলার সময় কানের কাছে ফোঁস-ফোঁসানি শুনতে পেলেন

ডুরেল। ওটাকে দু'আঙুলে টিপে ধরে মুখ তুলে তাকাতেই দেখলেন ফণা তুলেছে আরেকটা সাপ, তার মাথার মাত্র ফুটখানেক দূরে রয়েছে রেগে যাওয়া একজোড়া রূপালী চোখ। সাবধানে হাতের সাপটাকে ব্যাগে ভরে লাঠি তুললেন তিনি। ফণা তুলে রেখেছে দ্বিতীয় সাপটা, না নামালে চেপে ধরা যাবে না। অনেক চালাকি আর কায়দা-কসরত করে ওটাকে ফণা নামাতে বাধ্য করে ঘাড় চেপে ধরলেন লাঠির কাঁটা দিয়ে। তিনি যেমন ভয় পাচ্ছেন ওগুলোকে, ওগুলোও পাচ্ছে তাঁকে। দু-দুটো ধরা পড়ার পর বাকিগুলো সতর্ক হয়ে গেল, কিছুতেই কাঁটার আওতায় আসতে চাইল না। কাঁটা নেমে আসার আগেই তৃতীয় সাপটা মাথা সরিয়ে নিল, ছোবল মারল তামার কাঁটায়। দাঁতের আঘাতে টং করে শব্দ হলো। আরেকটা সাপ কাঁটার সামান্য ওপরে লাঠিতে দাঁত বসিয়ে দিল। কামড় ছাড়ল না। এমনকি তিনি যখন লাঠি উঁচিয়ে ওটাকে শূন্যে তুলে ফেললেন তখনও কামড়ে ধরে ঝুলে রইল বুলডগের মত। জোরে ঝাড়া মারলেন তিনি। কামড় ছুটে গেল সাপটার, কয়েক হাত ওপরে ছিটকে উঠে তাঁর প্রায় কাঁধ ঘেঁষে আবার মাটিতে পড়ল। লাঠি বাড়ালে আর কামড়ানোর চেষ্টা করল না, কাবু হয়ে গেছে, তুলে নিয়ে ব্যাগে ভরলেন।

সঙ্গীদের ফোঁস-ফোঁসানি শুনে আশপাশের গর্ত থেকে আরও সাপ বেরিয়ে আসতে লাগল। আধঘণ্টার মধ্যে ডজনখানেকেরও বেশি সাপ ধরে ফেললেন তিনি। অনেক হয়েছে, আর না। প্রচুর সাপ রয়ে গেছে গর্তগুলোতে। সব ধরতে যাওয়ার ঝুঁকি নেয়াটা ঠিক হবে না। এ পর্যন্ত যে একটা কামড়ও খাননি তিনি এটাই বড় ভাগ্য। ওপরে টেনে তুলতে বললেন ম্যাকটুটলকে।

টেনে তোলা হতে লাগল তাঁকে। ঘামে ভেজা, মাটি লেগে নোংরা হয়ে যাওয়া পিচ্ছিল হাতে শক্ত করে চেপে ধরে রেখেছেন সাপভর্তি ব্যাগটা।

'কি, বলেছিলাম না,' ওপরে তোলার সঙ্গে সঙ্গে উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠল ম্যাকটুটল, 'দেশে ফেরার আগে বেশ কিছু দুর্লভ সাপ আপনাকে উপহার দেব আমি, এখন পেলেন তো?'

মাথা ঝাঁকালেন শুধু ডুরেল, নির্বাক হয়ে গেছেন। ধপ করে বসে পড়লেন গর্তের পাড়ের মাটিতে। সিগারেট ধরাতে গিয়ে দেখলেন থরথর করে কাঁপছে হাত। কিছু নির্বোধ লোককে আনন্দ দেয়ার জন্যে কি সাংঘাতিক বিপদে গিয়ে ঝাঁপ দিয়েছিলেন ভেবে আরেকবার গালাগাল করলেন নিজেকে। বোকামি করেছেন, মস্ত বোকামি, নিজেকেও নির্বোধই মনে হতে লাগল তাঁর। কঠিন প্রতিজ্ঞা করলেন, কেউ যদি আর কোনদিন তাঁকে জিজ্ঞেস করে, 'জানোয়ার ধরা কি কঠিন কাজ?'—তিনি জবাব দেবেন, 'গর্দভের পাল্লায় পড়লে শুধু কঠিন নয়, ভয়ানক বিপজ্জনক, তাতে প্রাণ যাওয়ার আশঙ্কাও আছে!'

ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এলেন তিনি। তাকিয়ে দেখলেন সাতজন দর্শকের একজন নেই, ম্যাকটুটলের ভাই। জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার ভাই কই?'

'ওদিকে গিয়ে বসে আছে,' হেসে বলল ম্যাকটুটল। 'আপনি প্রথম সাপটা ধরতেই ওয়াক ওয়াক শুরু করল, বলল, মাথা ঘুরছে তার। থাকতে পারেনি এখানে। যে কাণ্ড করেছেন, অনেকেরই ওই অবস্থা হবে, তার আর কি দোষ!'

পাঁচ

দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর অংশে একটা দেশ আছে, নাম গায়ানা। এর একধারে আমাজন নদীর বিশাল বন। আমেরইনডিয়ান ভাষা থেকে এসেছে গায়ানা শব্দটা, মানে হলো পানির রাজ্য। এক শব্দে অঞ্চলটার এরচেয়ে ভাল বর্ণনা দেয়া আর সম্ভব নয়। তিনটে বড় বড় নদী বয়ে গেছে এ দেশের ভেতর দিয়ে, তার সঙ্গে এসে যুক্ত হয়েছে আরও হাজার হাজার খাল, নালা, ঝর্না। বর্ষাকালে পানি উপচে পড়ে এগুলোতে, বন্যায় ডুবিয়ে দেয় আশপাশের অঞ্চল। এ কারণেই ওখানকার জানোয়ারদের হয় সাঁতারু হতে হয়েছে, নয়তো গেছে। একই গোত্রের প্রাণী তাই শুকনো অঞ্চলে যারা মাটিতে বাস করে, তারা এখানে গাছে বাস করতে শিখেছে। যেমন ক্যামেরুনের শজারুরা থাকে মাটির গর্তে কিংবা গুহায়, গাছে ওঠার কথা ভাবতেই পারে না, সেই একই প্রজাতির শজারু এখানে তরতর করে গাছ বেয়ে উঠে যায়। ওদের পা আর থাবা একাজের উপযুক্ত করেই গড়ে দিয়েছে প্রকৃতি। এমনকি লেজটাও করে দিয়েছে বানরের মত, যাতে গাছের ডাল পেঁচিয়ে ধরে রাখতে পারে, মাটিতে না পড়ে।

দুই ভাগে বিভক্ত এই অঞ্চল। একভাগে বিশাল সাভান্না, অর্থাৎ তৃণভূমি, মাঝেসাঝে ঝোপঝাড় কিংবা ছোট জাতের গাছের জটলা, আরেক ভাগে বড় বড় গাছ আর লতায় পাতায় ছাওয়া ঘন বন। এ সবের ভেতর দিয়ে বয়ে যাওয়া বড় নদীগুলো গিয়ে পড়েছে সাগরে। উপনদীগুলোর কোন কোনটা খুবই সরু, মাত্র কয়েক ফুট চওড়া। কিছু আছে বিশাল। আর আছে খাঁড়ি, হাজার হাজার, নানা আকারের, নানা গভীরতার। এগুলোতে পড়ে পাতা পচে, গাছ পচে, বাদামী রঙের হয়ে যায় পানি, ওপরটা দেখায় চকচকে কালো আয়নার মত। গাছের বড় বড় ডাল ঝুঁকে থাকে পানির ওপর, তাতে জড়িয়ে থাকে স্প্যানিশ মস নামে একজাতীয় ছত্রাক, মাথাগুলো ধূসর সুতোর মত ঝোলে গাছের ডাল থেকে। আছে শত শত প্রজাতির অর্কিড, কত তার রঙ আর কি যে রূপ! গাছের ডাল আর কাণ্ডে জন্মায়, কোথাও কোথাও এত বেশি পরিমাণে, গাছগুলোকে মনে হয় রঙিন গহনায় ছাওয়া।

পানিতে জন্মায় সবুজ জলজ-উদ্ভিদ, কোথাও পাতলা, কোথাও এত ঘন, গায়ে গায়ে লেগে থেকে শক্ত গালিচার মত তৈরি করে ফেলে, ওগুলোতে ফুল ফোটে বেগুনি আর হলুদ রঙের। তীরের কাছে যেখানে রোদ পড়ার সুযোগ পায়, সেখানে দেখা যাবে বিশাল সব জলপদ্ম, ফুল হয় বড় চায়ের পটের সমান আর পাতাগুলো একেকটা সাইকেলের চাকার মত। এ সব জায়গায় ডিঙিতে করে যাওয়ার সময় আপনার মনে হবে বুঝি সবুজ লন দিয়ে ভেসে চলেছেন।

চিড়িয়াখানার জন্যে জন্তু-জানোয়ার ধরে আনতে এই গায়ানায়ও গিয়েছিলেন জেরাল্ড ডুরেল। ওখানে পৌঁছে রাজধানী জর্জটাউনে হেডকোয়ার্টার করলেন

তিনি। জানোয়ারের জন্যে প্রচুর খাবার দরকার হয়, সেটা সহজে জোগাড় করা সম্ভব এখানে; তা ছাড়া ডক আছে, ধরে আনা জানোয়ার জাহাজে তুলে দেশের উদ্দেশে পাড়ি জমানোও সহজ। ওখানে হেডকোয়ার্টার করার আরেকটা বড় কারণ, ওখান থেকে দেশের ভেতরে যেদিকে ইচ্ছে চলে যাওয়া যায় জানোয়ারের খোঁজে।

পোমেরুন নদীর কাছে ঘাসে ঢাকা অঞ্চলে প্রথম অভিযান চালালেন তিনি। জর্জটাউন থেকে খাঁড়ি ধরে চলে গেলেন আজব জলাভূমির গভীরে লুকানো এক আমেরইনডিয়ান শহর সান্টা মারিয়ায়। সারাটা দিন লেগে গেল যেতে। আয়নার মত চকচকে পানির ওপর দিয়ে যেন পিছলে যেতে লাগল তাঁর নৌকা। দুধারে গাছের সমারোহ। বড় আকারের কালো কাঠঠোকরা পাখি উড়তে দেখলেন নৌকার সামনে, বুকের কাছটা লাল, থেকে থেকেই ক্যাঁক ক্যাঁক তীক্ষ্ণ চিৎকার করে ওঠে, পোকা বের করার জন্যে ঠোঁট দিয়ে ঠুক-ঠুক করে ঠোকর মারে মরা গাছের গায়ে। তীরের কাছে ঝোপঝাড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে বসে আছে চড়ুইর সমান বড় হলুদ ঠোঁটওয়ালা কালো রঙের একজাতের পাখি, জলা অঞ্চলে ওদের বাস। কড়া লাল রঙের আইবিস পাখি হঠাৎ করে উড়ে যাচ্ছে নৌকা দেখে চমকে গিয়ে। তীরের কাছে জলজ উদ্ভিদে ঘুরে বেড়াচ্ছে একধরনের আজব পাখি জ্যাকানা। লম্বা, সরু পায়ের মাথায় খুব সরু একগুচ্ছ আঙুল থাকে এদের, পানিতে ভেসে থাকা পদ্মপাতা আর অন্যান্য জলজ উদ্ভিদের ওপর দিয়ে স্বচ্ছন্দে হাঁটাচলা করতে সাহায্য করে এদেরকে এই পা।

নৌকা দেখে চমকে গিয়ে পানিতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে আরও একটা জীব, কেইমেন, দক্ষিণ আমেরিকার কুমির। নৌকা আসতে দেখলে মাথা তুলে বিশাল হাঁ করে তাকিয়ে থাকে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত, তারপর চার পায়ে হামা দিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে ঝাঁপ দেয় পানিতে, ক্লুপ করে একটিমাত্র শব্দ তুলে তলিয়ে যায়।

এই জ্যাকানা আর কেইমেনকে এক মজার কাণ্ড করতে দেখেছেন একবার ডুরেল। যাই হোক, সে গল্প পরে বলছি।

সান্টা মারিয়ায় পৌঁছতে পৌঁছতে রাত দুপুর হয়ে গেল। পরদিন গাঁয়ের আদিবাসী আমেরইনডিয়ানদের সাহায্য নিয়ে জানোয়ার জোগাড় করতে বেরোলেন তিনি। ওদের অনেকেই বন থেকে নানা রকম জানোয়ার ধরে এনে পোষে, কেউ কেউ বিক্রি করতে রাজি হলো, তাদের কাছ থেকে কিনে নিলেন সেসব। এর মধ্যে আছে উজ্জ্বল রঙের ম্যাকাও, পাখিগুলোর চিৎকার এত জোরাল আর কর্কশ, কান ঝালাপালা করে দেয়। আছে কয়েকটা অল্প বয়েসী বোয়া-কনস্ট্রিকটর আর দু'তিনটে ক্যাপুচিন মাংকি। বোয়া-কনস্ট্রিকটর হলো একজাতের অজগর। ইনডিয়ানরা এই সাপ পোষে ঘর থেকে ইঁদুর সাফ করার জন্যে। ওরা বলে, যে কোন বিড়ালের চেয়ে ইঁদুর শিকারে অনেক বেশি দক্ষ এই সাপ, বিড়ালের চেয়ে দেখতেও সুন্দর; লাল, রূপালী, কালো এবং সাদা রঙের এই প্রাণীগুলো যখন ঘরের খুঁটি বা চালার আড়ায় পেঁচিয়ে থাকে, অলঙ্কারের মত লাগে দেখতে।

কিছু কিছু জীব আছে, যেগুলো পুষে কোন লাভ নেই, ধরাও সহজ নয়, সেসব পাওয়া গেল না আদিবাসীদের কাছে, ধরে আনতে হবে। তার একটা

জায়ান্ট অ্যান্ট-ঈটার।

গায়ানায় অ্যান্ট-ঈটার বা পিঁপড়েখেকো আছে তিন রকমের। একটা আছে বিশাল আকৃতির, ছয় ফুট লম্বা, সেজন্যে নামই হয়েছে জায়ান্ট অ্যান্ট-ঈটার; দ্বিতীয়টা পিকিনিজ কুকুরের সমান বড়, আঞ্চলিক নাম টামানডুয়া, আর তৃতীয়টা পিগমি অ্যান্ট-ইটার, টেনেটুনে আট ইঞ্চি লম্বা হয়। এই তিন প্রাণীর বাস তিন ধরনের অঞ্চলে যেখানে যার থাকতে ভাল লাগে, একটার জায়গায় আরেকটা সাধারণত যায় না, কদাচিৎ চোখে পড়ে। গায়ানার উত্তরাঞ্চলের তৃণভূমিতে থাকতে পছন্দ করে জায়ান্ট অ্যান্ট-ঈটার। বাকি দুটোর একটা, টামানডুয়ার পছন্দ হালকা বন, একধারে খোলা জায়গা থাকলে খুব ভাল, আর পিগমিরা গাছপালায় ঢাকা ঘন বনের বাইরে এক পাও ফেলবে না।

জায়ান্ট অ্যান্ট-ঈটার ধরতে হলে যেতে হবে সাভান্নায়। সুতরাং দুশো মাইল পথ বিমানে করে পাড়ি দিয়ে একজন বন্ধু সহ সেখানে পৌঁছলেন ডুরেল। রুপুননুন নদীর তীরে এক র‍্যাঞ্চে তাঁদেরকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল প্লেন। এখানে পরিচয় হলো ফ্র্যান্সিস নামের এক অসাধারণ বুদ্ধিমান ইনডিয়ান শিকারির সঙ্গে। কি চান, তাকে জানালেন তিনি। ধরা যাবে না, ওই দানব ধরা সম্ভব নয়–সাফ বলে দিল সে। অনেক তর্কবিতর্কের পর নিমরাজি হলো, বলল, একা বেরোতে হবে তাকে, খুঁজে বের করতে হবে আগে বিশাল ঘাসের বনে কোথায় লুকিয়ে আছে পিঁপড়েখেকোর বাসা। তারপর এসে তাঁকে নিয়ে গিয়ে ধরার চেষ্টা করবে একআধটা দানবকে।

ওর কথায় রাজি হওয়া ছাড়া উপায় নেই। র‍্যাঞ্চ হাউসে রয়ে গেলেন ডুরেল আর তাঁর বন্ধু। তিনদিন পর হাসিমুখে এসে হাজির হলো ফ্র্যান্সিস, জানাল, সফল হয়েছে। পাওয়া গেছে পিঁপড়েখেকো। এক জায়গায় পিঁপড়ের বাসা কাটার তাজা দাগ দেখে এসেছে সে। ভীষণ শক্ত উঁই কিংবা পিঁপড়ের ঢিবিকে থাবার ধারাল বাঁকা নখ দিয়ে মাখনের মত চিরে ফেলে পিঁপড়েখেকো, লম্বা জিভ ঢুকিয়ে দিয়ে বাসা থেকে পিঁপড়ে ধরে এনে খায়।

পাওয়া যখন গেছে, আর তর সইল না ডুরেলের। পরদিন ভোরেই ঘোড়ায় চড়ে বন্ধুকে নিয়ে ফ্র্যান্সিসের সঙ্গে দানব শিকারে বেরিয়ে পড়লেন তিনি। বিশাল সোনালি ঘাসের প্রান্তর, যেদিকে তাকানো যায় শুধু ঘাস আর ঘাস বাতাসে দোলে, রোদে পোড়ে, মাঝে মাঝে ছোটখাটো ঝোপঝাড় সবুজ ফোঁটার মত হয়ে আছে। ঘাসবনের কিনারায় দিগন্তের কাছে তৃণভূমিকে যেন বেড়া দিয়ে রেখেছে ফ্যাকাসে সবজে-নীল পর্বত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটানা চলেও নীল আকাশে চক্কর দিতে থাকা একজোড়া খুদে বাজপাখি ছাড়া আর কোন জীব চোখে পড়ল না।

অবাক লাগল ডুরেলের, এতবড় তৃণভূমি কি এমনই প্রাণীশূন্য! তবে আর কিছুক্ষণ পরেই তাঁর প্রশ্নের জবাব মিলল। ডিম্বাকার একটা বড় প্রাকৃতিক দীঘির কাছে আসতেই দেখা গেল পানিতে ভাসছে রাশি রাশি জলপদ্ম, কিনারের অগভীর পানিতে শ্যাওলা, আর তীরের কাদাপানিতে ঘন হয়ে জন্মেছে ছোট জাতের উদ্ভিদ। ঝাঁকে ঝাঁকে ফড়িং উড়ছে, ঘোড়ার খুরের কাছ থেকে ছিটকে সরে যাচ্ছে ঝলমলে রঙের গিরগিটি, পানির কিনারে পড়ে থাকা মরা ডালে বসে আছে

মাছরাঙা, নলখাগড়া আর অন্যান্য ঝোপঝাড় শত-সহস্র পাখির কলরবে মুখর। আরও কিছুদূর এগোনোর পর দেখা গেল দীঘির অপর পাড়ে বসে আছে গোটা দশেক বড় জাতের বক জ্যাবিরু স্টর্ক, একেকটা চার ফুট উঁচু, লম্বা ঠোঁট নামিয়ে স্থির হয়ে আছে পাথরের মূর্তির মত। দীঘি পার হয়ে আবার তৃণভূমিতে ঢুকতেই আবার প্রাণীশূন্য হয়ে এল প্রকৃতি। লম্বা ঘাসের মধ্যে আবার শুধু ঘোড়ার খুরে ঘষা লাগার হুসুক্ হুসুক্ শব্দ।

এই ঘাসের বন এক ধরনের পানিশূন্য মরু অঞ্চল, পানি নেই, তাই জীবনও নেই, শুকনো ওই ঘাসের দঙ্গল বাদে। দীঘিতে পানি আছে, তার আশেপাশে প্রাণীও আছে। ডুরেল বুঝলেন, সাভান্নার ভেতর দিয়ে মাইলের পর মাইল পেরিয়ে গেলেও কোন প্রাণী দেখতে পাবেন না যদি না থাকে কোন পানির উৎস ডোবা, পুকুর, কিংবা দীঘি। যেখানে পানি, সেখানেই উপচে পড়ে জীবন।

ছয়

দুপুর নাগাদ গন্তব্যে পৌঁছলেন তাঁরা। ঘোড়া থামিয়ে ফ্র্যান্সিস জানাল এখানেই আছে পিঁপড়েখেকোর বাসা। মাঝখানে বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখে দুদিকে ছড়িয়ে পড়ে চলতে হবে। যতটা সম্ভব শব্দ আর হই-হট্টগোল করতে হবে যাতে ঘুম ভেঙে যায় পিঁপড়েখেকোর। তারপর ওকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে বাঁদিকে যেখানে ঘাসের উচ্চতা কম, ভালমত দেখা যায় যাতে। ঘোড়ায় চেপে তাড়া করে ওর কাছে পৌঁছে যাওয়া তখন সহজ হবে।

পাশাপাশি থেকে এগোলেন তিনজনে। ঘাস এখানে এত লম্বা, ঘোড়ার পেট ছুঁয়ে যায়। গলা ফাটানো চিৎকার আর কোলাহল করতে করতে এগোলেন তাঁরা পিঁপড়েখেকোর বাসার দিকে। কড়া রোদে মাটি শুকিয়ে পোড়া ইঁটের মত শক্ত হয়ে গেছে, ফেটে চৌচির, বড় বড় ফাটল হয়ে আছে, কোথাও কোথাও গর্ত। সেসব জায়গায় পা পড়লে হোঁচট খাচ্ছে ঘোড়া। প্রচণ্ড ঝাঁকি লাগছে।

হঠাৎ চিৎকার করে উঠল ফ্র্যান্সিস। ফিরে তাকিয়ে ডুরেল দেখলেন, হাত নেড়ে তাঁকে ডাকছে সে। দেখলেন ঘাসের মধ্যে কালো একটা কি যেন নড়ছে। ছুটলেন তিনি। দেখা পাওয়া গেছে পিঁপড়েখেকোর। ভয় পেয়ে আরও লম্বা আর গভীর ঘাসের মধ্যে ঢুকে যাওয়ার চেষ্টা করল ওটা। কিন্তু তিনদিক থেকে ঘিরে ফেলে ওটাকে ঠেকানো হলো। আর কোনদিকে পথ না দেখে বাধ্য হয়ে তাঁরা যেদিকে চাইছেন সেদিকেই ছুটল পিঁপড়েখেকো। মাটিতে থপ-থপ আওয়াজ তুলল ওটার বড় বড় নখওয়ালা পা, মানকচুর কাণ্ডের মত লম্বা মুখটা দুলছে এদিক ওদিক, রোমশ ফোলা লেজটা উড়ছে বাতাসে ফেঁপে ওঠা কাশগুচ্ছের মত।

পেছনে তেড়ে গেল শিকারিরা। একপ্রান্তে রয়েছেন ডুরেল, জন্তুটাকে লম্বা ঘাসের মধ্যে ঢুকে যাওয়া থেকে বিরত রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। অন্য মাথায় রয়েছে ফ্র্যান্সিস। ডুরেলের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে এগিয়ে আসছে। ছুটন্ত

জন্তুটাকে লক্ষ্য করে ল্যাসো ছুঁড়ল সে। তাড়াহুড়ো আর উত্তেজনায় ফাঁসের আকার ঠিক রাখতে পারেনি, অনেক বড় করে ফেলেছে; তাই লক্ষ্যভেদ করলেও শিকারকে আটকাতে পারল না, সার্কাসে রিঙের ভেতর দিয়ে কুকুর আর বিড়াল যেভাবে লাফিয়ে বেরিয়ে যায় তেমনি করে দড়ির ফাঁসের ভেতর দিয়ে পার হয়ে গেল পিঁপড়েখেকো। চলার গতি বিন্দুমাত্র না কমিয়ে ফোঁসফাঁস ঘোঁৎ-ঘাঁৎ করে ছুটতে থাকল ঘাসের ভেতর দিয়ে।

ঘোড়া থামিয়ে ল্যাসো গোটাল ফ্র্যান্সিস, আবার তাড়া করল জন্তুটাকে। চোখের পলকে পৌঁছে গেল ওটার কাছে, আবার ল্যাসো ছুঁড়ল। এবার আর ভুল করেনি দক্ষ ফাঁসুড়ে, জন্তুটার কোমরে আটকে গেল ফাঁস। চোখের পলকে কি করে যে লাফ দিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে গেল সে, সে এক দেখার মত ব্যাপার। দুহাতে দড়ি চেপে ধরে রেখেছে। টানতে টানতে ওকে ঘাসের মধ্যে দিয়ে ছুটিয়ে নিয়ে চলল পিঁপড়েখেকো।

ঘোড়া থেকে নেমে ওকে সাহায্য করতে ছুটে গেলেন ডুরেল। রেগে বোম হয়ে আছে পিঁপড়েখেকো। অসম্ভব শক্তি দানবটার শরীরে। দুজন মানুষের শক্তিকেও পরোয়া করল না, সামান্যতম গতি কমল না ওটার, টানতে টানতে নিয়ে চলল। খড়খড়ে শক্ত ঘাসের মধ্যে দিয়ে পাথরের মত শক্ত মাটিতে ছুটতে ছুটতে পা ব্যথা হয়ে গেল দুজনের, দড়ির ঘষায় হাতের চামড়া ছুলে রক্ত বেরোতে শুরু করল, কিন্তু পিঁপড়েখেকোর ছোটার বিরাম নেই।

কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল হঠাৎ ফ্র্যান্সিস। কি দেখল সে? ফিরে তাকালেন ডুরেল। দেখলেন একটা ছোট গাছ, বারো ফুট উঁচু, কয়েক মাইলের মধ্যে ওটাই একমাত্র গাছ। প্রাণপণ চেষ্টায় টানতে টানতে দানবটাকে গাছটার কাছে সরিয়ে নিলেন দুজনে। ঘামে নেয়ে গেছে শরীর। জোরে জোরে হাঁপাচ্ছেন। অনেক কায়দা-কসরত করে দড়ির মাথাটা পেঁচিয়ে ফেললেন গাছের গায়ে। হঠাৎ গাছের মাথার দিকে চোখ পড়তে আঁতকে উঠল ফ্র্যান্সিস। মুখ তুললেন ডুরেল। ঠিক মাথার ওপরে বিরাট এক ভীমরুলের বাসা। দড়ি ধরে টানছে পিঁপড়েখেকো, হ্যাঁচকা টান দিয়ে বাঁকিয়ে ফেলছে গাছ, প্রচণ্ড নাড়া লাগছে। এই শয়তানি মোটেও পছন্দ হলো না ভীমরুলদের। ভীষণ রেগে গিয়ে নিতান্ত বেরসিকের মত ভনভন করে তেড়ে এল। ওদের সঙ্গে মোলাকাতের বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই, পেছন ফিরে ঝেড়ে দৌড় দিলেন ডুরেল আর ফ্র্যান্সিস। পিঁপড়েখেকো ভয় পেল না ওদের। তার লম্বা রোমে ঢাকা শরীরে হুল ফোটাতে পারবে না ভীমরুলেরা।

শক্ত দড়ি ছিঁড়ে জন্তুটা পালাতে পারবে না ভেবে ঘোড়াগুলোর কাছে ফিরে চললেন দুজনে। ডুরেলের বন্ধুও অপেক্ষা করছেন ওখানে। সঙ্গে করে বড় বড় বস্তা নিয়ে আসা হয়েছে, আর প্রচুর শক্ত দড়ি। সেসব সহ গাছটার কাছে আবার ফিরে আসতে ডুরেলের চোখে পড়ল ফাঁস ঢিলা করে তার ভেতর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে পিঁপড়েখেকো। কুকুরের মত ঝাঁকি মেরে, শরীর মুচড়ে মুচড়ে ফাঁসের ভেতর থেকে বেরিয়ে গেল দানবটা, তাড়াহুড়ো না করে তারিক্কি চালে ঘাস মাড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল।

গাছ থেকে ল্যাসো খোলার জন্যে ছুটে গেল ফ্র্যান্সিস, ভীমরুলের কামড়ের পরোয়া করল না আর। অন্য কোন উপায় না দেখে একটা সাধারণ দড়ির মাথায় ফাঁস বানিয়ে দৌড় দিলেন ডুরেল। ছুঁড়ে মারলেন পিঁপড়েখেকোর নাক সই করে। কিন্তু আনাড়ি হাতে ল্যাসো ছুড়লে যা হবার তাই হলো, মিস করলেন। হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল পিঁপড়েখেকো। আবার মিস। আবার ছুঁড়লেন। এবারও লাগাতে পারলেন না।

বিরক্তির চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেল পিঁপড়েখেকো। দৌড়ে না পালিয়ে আচমকা থেমে গিয়ে পেছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে মুখোমুখি দাঁড়াল। ওর মাথাটা রয়েছে ডুরেলের বুকের সমতলে, থাবা তুলে ধরেছে, ছয় ইঞ্চি লম্বা বাঁকা নখগুলো আঘাত হানার জন্যে তৈরি। ওই মারাত্মক নখের ছোঁয়া লাগলেই চিরে ফালাফালা হয়ে যাবে মুখ।

ঘোঁৎ-ঘোঁৎ, হিসহিস করছে, লম্বা মুখটাকে এপাশ ওপাশ নাড়তে নাড়তে থাবা দোলাচ্ছে মুষ্টিযোদ্ধার ভঙ্গিতে, যেন বলছে, 'বাপের বেটা হলে এসো দেখি, হয়ে যাক এক হাত!' কিন্তু তার আমন্ত্রণে সাড়া না দিয়ে কাপুরুষ সেজে থাকাটাই উত্তম মনে করলেন ডুরেল, বীরত্ব দেখানোর জন্যে ওই নখের আওতায় গেলে কি ঘটবে অনুমান করা যায়, ফ্র্যান্সিস আর অন্যেরা আসার অপেক্ষা করতে লাগলেন। ওরা এলে ওদের দিকে নজর থাকবে জন্তুটার, এই সুযোগ পেছন থেকে ওকে পাকড়াও করার চেষ্টা করতে হবে ভেবে পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। কিন্তু যতবারই পাশ কাটাতে যান তিনি, লাটিমের মত পাক খেয়ে ওটা তাঁর দিকে ঘুরে যায়, থাবা দুটো এক ভঙ্গিতে সামনে বাড়িয়ে রেখেছে। অগত্যা মাটিতে বসে পড়ে ফ্র্যান্সিসদের অপেক্ষা করতে লাগলেন তিনি।

এতে বোধহয় খানিকটা হতাশই হলো পিঁপড়েখেকো। ওর ভাষায় 'দূর ব্যাটা কাপুরুষের বাচ্চা!' বলে গাল দিয়ে যেন থাবা নামিয়ে নিল মাটিতে। কাপুরুষদের সঙ্গে লড়াইয়ে যেটুকু জখম হয়েছে সেটা মেরামত করতে ব্যস্ত হলো। পিঁপড়ে কিংবা উঁইপোকা ধরে খাবার সময় আঠাল ঘন থু-থু বেরিয়ে আসে ওদের জিভে। লম্বা জিভটা বের করে পিঁপড়ের ওপর বিছিয়ে দেয় ওরা, তাতে লেগে যায় পিঁপড়ে, জিভ টেনে মুখের ভেতর নিয়ে গিয়ে ওগুলোকে তখন গিলে ফেলে পিঁপড়েখেকো। ঘাসের ওপর দিয়ে ছোটার সময় জিভ বেরিয়ে পড়েছিল দানবটার। আঠা বেরিয়ে লেগে গেছে নাকেমুখে। তাতে আটকে গেছে ঘাস, নাক ঢেকে দিয়েছে। ধারাল নখ দিয়ে সাবধানে পরিষ্কার করতে শুরু করল সেগুলো। কাজ শেষ করে ভারি দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে গা ঝাঁকাল কুকুরের মত করে, তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে থপ-থপ করে হাঁটা দিল ঘাসের ভেতর দিয়ে।

ল্যাসো হাতে ফ্র্যান্সিস ফিরে আসতেই আবার দানবটার পিছু নিলেন ডুরেল। টের পেতেই ঘুরে দাঁড়াল ওটা, আগের বারের মতই পেছনের পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে লড়াই করার জন্যে থাবা বাড়িয়ে দিল। কিন্তু দুজনের সঙ্গে চালাকিতে এঁটে উঠতে পারল না ডুরেল ওর সামনে দাঁড়িয়ে ওর দৃষ্টি আটকে রাখলেন, পা টিপে টিপে পেছনে চলে গেল ফ্র্যান্সিস, ফাঁস ছুঁড়ে মারল। যেই বুঝল জন্তুটা, আবার ওকে আটকে ফেলা হয়েছে, আবার দুজনকে টেনে নিয়ে দৌড় মারল

আগের বারের মত। আধঘণ্টা যাবৎ ওর সঙ্গে ছোটাছুটি করার সময় একের পর এক ফাঁস ছুঁড়ে মারতে থাকল ফ্র্যান্সিস, গলা, কোমর, থাবা, পা, সব বেঁধে ফেলল। ছোটার অবস্থা রইল না আর ওটার। ওটাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে আরও কিছু দড়ি দিয়ে পেঁচিয়ে একেবারে অনড় করে দেয়ার পর মোটা বস্তায় ভরা হলো, শুধু নাকটা বের করে রাখা হলো বাইরে, শ্বাস নেয়ার জন্যে।

এই বিজয়ের পর একে অন্যকে অভিনন্দন জানালেন দুজনে। জন্তুটাকে বয়ে নিয়ে এলেন ঘোড়ার কাছে। দেখেই খেপে গেল ঘোড়াগুলো, কিছুতেই বয়ে নিতে রাজি হলো না ফুঁসতে থাকা বেয়াড়া জীবটাকে। ঝাড়া পনেরো মিনিট ব্যয় করেও যখন কোনমতেই ওগুলোকে বাধ্য করা গেল না, ফ্র্যান্সিস ঠিক করল, পিঁপড়েখেকোকে পিঠে করে বয়ে নেবে সে। তার ঘোড়াটাকে টেনে নিয়ে যাবেন ডুরেল। এত ভারি একটা জীবকে বয়ে নেয়া সম্ভব হবে কিনা সন্দেহ হলো ডুরেলের, কারণ র‍্যাঞ্চ ওখান থেকে বহুমাইল দূর, রোদ যেন চড়চড় করে পোড়াচ্ছে শরীরের চামড়া।

আর কোন উপায় না দেখে একটা ঘোড়ায় চেপে বসলেন ডুরেল, আরেকটা ঘোড়ার দড়ি ধরে টেনে নিয়ে চললেন। ভারি বোঝা কাঁধে নিয়ে কোনমতে একের পর এক পা ফেলে চলল ফ্র্যান্সিস। তার চলাকে আরও কষ্টকর করে তোলার জন্যে যত রকম শয়তানি সম্ভব হলো করল পিঁপড়ে-খেকো, বার বার শরীর মুচড়ে বস্তা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা চালাল, ধরে রাখাই কঠিন হয়ে পড়ল ফ্র্যান্সিসের জন্যে। এক ঘণ্টায় মাত্র দুই মাইল পথ পাড়ি দিল ওরা। আট-দশ কদম যাওয়ার পর পরই বস্তাটা কাঁধ থেকে নামিয়ে বিশ্রাম নিতে হচ্ছে ফ্র্যান্সিসকে।

এই হারে চললে র‍্যাঞ্চে পৌঁছতে হপ্তাখানেক লেগে যাবে। নতুন বুদ্ধি বাতলাল ফ্র্যান্সিস। বলল, ওখানে বসে একজন পাহারা দেবে পিঁপড়েখেকোকে, অন্য দুজন যাবে আউট-স্টেশনে সাহায্য আনার জন্যে। দিগন্তের দিকে হাত তুলে একটা কালো বিন্দু দেখাল সে। তার দৃঢ় বিশ্বাস, ওখানে গেলে একটা 'ড্র্যাফটবল' পাওয়া যাবেই। ইংরেজি ভাল বলতে পারে না সে, কোনমতে কাজ চালানোর মত যা পারে যৎসামান্য সেই শব্দভাণ্ডারের জোগান থেকে শব্দ ব্যবহার করে কিছুতে বোঝাতে পারল না জিনিসটা কি সুতরাং বন্ধুকে ওখানে একটা ঝোপের ছায়ায় পিঁপড়েখেকোর পাহারায় বসিয়ে ফ্র্যান্সিসের সঙ্গে আউট-স্টেশনে ড্র্যাফটবলের সন্ধানে রওনা হলেন ডুরেল।

ওখানে পৌঁছে সাক্ষাৎ মিলল এক হাসিখুশি ইনডিয়ানের। সাগ্রহে তুলে নিলেন ডুরেল তার দেয়া এক কাপ কফি। এ জিনিসটাই এখন সবচেয়ে বেশি চাইছিলেন তিনি। কফি খাওয়ার পর তাঁকে আর ফ্র্যান্সিসকে ড্র্যাফটবুল দেখাতে বাইরে নিয়ে গেল সে এতক্ষণে বোঝা গেল কি বোঝাতে চেয়েছিল ফ্র্যান্সিস—ড্রাফট বুল, অর্থাৎ টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্যে বলদ। এ সময় উদয় হলো তার স্ত্রী। ফ্র্যান্সিস বলল, আর কোন অসুবিধে নেই, তার স্ত্রীই বলদে চড়ে ওটাকে সাভান্নায় নিয়ে যেতে পারবে, আর ডুরেলরা যাবেন ঘোড়ায় চেপে।

বিশাল বলদের পিঠে লাফ দিয়ে উঠে বসল ছোটখাটো মহিলাটি। তার লম্বা কালো চুল পিঠ ছাড়িয়ে গিয়ে কোমরের কাছে লুটাচ্ছে। হাতের লাঠি দিয়ে বাড়ি

মারতেই চলতে শুরু করল বলদটা।

যেখানে পিঁপড়েখেকোকে রেখে যাওয়া হয়েছিল সেখানে পৌঁছে দেখা গেল আবার গণ্ডগোল বাধিয়ে বসে আছে ওটা। বস্তার ভেতর থেকে অর্ধেক বেরিয়ে পড়েছে, বস্তাটা এখন তার পেছনে আটকে আছে এমন ভাবে মনে হয় যেন বস্তা-দৌড়ের জন্যে তৈরি হয়েছে সে। ঘাসের ওপর দিয়ে নেচে নেচে ছুটে বেড়াচ্ছে একবার এদিক একবার ওদিক, ছুটিয়ে মারছে ডুরেলের বন্ধুকে। নেহায়েত সময়মত পৌঁছেছেন তারা, আর খানিক দেরি হলেই মুক্তি পেয়ে যেত পিঁপড়েখেকো, বন্ধুর সাধ্য হত না ওটাকে আবার ধরে। অনেক কষ্টে আবার ওটাকে আটকে ফেলে নতুন বস্তায় ভরে আরও শক্ত করে বাঁধা হলো। ডুরেলরা চলে যাওয়ার পর কি কি ঘটনা ঘটেছে, বিস্তারিত বললেন বন্ধু।

প্রথমেই কি করে যেন দড়ি খুলে ফেলল তার ঘোড়াটা। বাঁধনমুক্ত হয়েই স্থির করল সাভান্নায় নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরোবে। তার মর্জি মাফিক রওনা হয়ে গেল একদিকে। ছোটাছুটি করে গলদঘর্ম হয়ে অনেক কষ্টে সেটাকে আবার পাকড়াও করলেন বন্ধু। ঘোড়াটাকে নিয়ে ফিরে এসে দেখেন মুচড়ে মুচড়ে বস্তার ভেতর থেকে অর্ধেক শরীর বের করে ফেলেছে পিঁপড়েখেকো, ধারাল নখ দিয়ে বস্তাটাকে কাটছে। তাড়াতাড়ি গিয়ে ওটাকে ঠেলেঠুলে আবার বস্তায় ভরে কাটা দড়িগুলো দিয়েই বাঁধলেন বন্ধু। তাড়াহুড়োয় ঘোড়াটাকে বাঁধার কথা ভুলে গিয়েছিলেন, ফিরে তাকিয়ে দেখেন আবার পালিয়েছে ওটা। ধরে নিয়ে ফিরে এসে দেখেন আবার বস্তার ভেতর থেকে বেরিয়ে গেছে পিঁপড়েখেকো। ওটাকে ধরার জন্যে ছোটাছুটি করছেন তিনি, এ সময় এসে হাজির হয়েছেন ডুরেলরা।

ঘোড়ায় চড়ে আগেই চলে এসেছেন তাঁরা, বলদ অত জোরে ছুটতে পারে না, ওটাকে নিয়ে ফ্র্যান্সিসের স্ত্রীর আসতে কিছু দেরি হলো। পিঁপড়েখেকোকে দেখে ঘোড়ার মত খেপে গেল না বলদ, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ওটার পিঠে তোলা হলো বস্তাবন্দী পিঁপড়েখেকোকে। কেয়ারই করল না বলদটা। ওটার পিঠে আলুর বস্তা তোলা হচ্ছে, নাকি র‍্যাটলস্নেক, না অন্য কিছু, ফিরে দেখারও প্রয়োজন মনে করল না। প্রচুর হিস হিস করল পিঁপড়েখেকো, শরীর মোচড়াল, কিন্তু বলদের গতিতে বাধা দিতে পারল না, একনাগাড়ে হেঁটে চলল ওটা ঘাসের ভেতর দিয়ে।

র‍্যাঞ্চে পৌঁছতে পৌঁছতে রাত হয়ে গেল। বস্তা থেকে পিঁপড়েখেকোকে বের করে গলায় দড়ি লাগিয়ে বড় একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হলো। এক পাত্র পানি রেখে দিলেন ওটার কাছে ডুরেল। খুব ভোরে উঠে পিঁপড়েখেকো কি করছে দেখার জন্যে উঁকি দিতেই ধক করে উঠল তাঁর বুক। নেই ওটা! দড়ি কেটে পালাল নাকি? লাফ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে ছুটে গেলেন গাছের কাছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন না, আছে। গাছের শেকড়ের ফাঁকে কুণ্ডলী পাকিয়ে, ফোলা রোমশ লেজটা দিয়ে শরীর ঢেকে শেকড়ের সঙ্গে মিশে গিয়ে এমন করে শুয়ে আছে, দরজায় দাঁড়িয়ে দেখতে পাননি তিনি। পিঁপড়েখেকোকে ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখার আগে একটা প্রশ্ন ছিল মনে, এতবড় রোমশ লেজ দিয়ে কি করে ওরা? এখন বুঝতে পারলেন। ঘাসের বনে অগভীর একটা গর্ত খুঁড়ে নিয়ে তাতে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ে ওরা। কুঁড়েঘরের চালার মত করে গায়ের ওপর বিছিয়ে দেয়

ওই লেজ। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাসের সাধ্য নেই ওই রোমের আচ্ছাদন ভেদ করে তার শরীরে গিয়ে লাগে।

গায়ানায় বেশ কিছু আজব প্রাণী জোগাড় করেছেন ডুরেল। জর্জ টাউনে থাকার সময় একদিন এক পরিচিত বৃদ্ধা নিগ্রো মহিলা পুরানো একটা টিনের কেটলিতে করে পাঁচটা মাছ নিয়ে এল। তার কাছ থেকে সেগুলো কিনে নিলেন তিনি। ঘরে এনে বড় একটা গামলায় ঢাললেন। অস্বাভাবিক কি যেন রয়েছে ওগুলোর মধ্যে। প্রথমে কয়েক সেকেণ্ড ব্যাপারটা ধরতে পারলেন না। তারপর হঠাৎ করেই লক্ষ করলেন গোলমালটা ওগুলোর চোখে।

ভালমত দেখার জন্যে একটা মাছকে সাবধানে তুলে নিয়ে কাঁচের জারে রাখলেন তিনি। তাজ্জব হয়ে দেখলেন মাছটার চারটে চোখ। অক্ষিকোটর দুটোই, চোখগুলো অনেক বড়, মাথার কাছ থেকে ঠেলে বেরিয়ে আছে জলহস্তীর চোখের মত। তবে একেক চোখে দুটো করে মণি, এমন করে বসানো যাতে একটা দিয়ে ওপর দিকে নজর রাখতে পারে, আরেকটা দিয়ে নিচের দিকে। সাগরের পানিতে ওপরে ভেসে উঠে জীবনের বেশির ভাগ সময় সাঁতরে কাটায় এরা, একজোড়া চোখ দিয়ে পানির ওপরটা দেখে, খাবারের সন্ধান করে, আরেক জোড়া দিয়ে দেখে নিচেটা, দেখে গভীর তলদেশ থেকে কোন বড় মাছ উঠে আসছে কিনা তাকে আক্রমণ করার জন্যে।

আজব জীব আরও অনেক আছে গায়ানায়। এক জাতের পাখি আছে, নাম স্টিংকিং আন্না, গায়ানিজরা বলে হোটজিন। এ রকম নামকরণের কারণ, বিটকেলে দুর্গন্ধ ছড়ায় এরা। ডানায় মানুষের বুড়ো আঙুলের মত দেখতে একটা আঙুল আছে এদের, মাথায় আঁকশির মত বাঁকা নখ লাগানো। ডিম ফোটার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বাসা থেকে হামা দিয়ে বেরিয়ে আসে শিশু হোটজিন, ওই নখের সাহায্যে বাকল আঁকড়ে ধরে বানরের মত ঘুরে বেড়ায় ডাল থেকে ডালে। সাধারণত কাঁটাঝোপের ডালে পানিতে ঝুঁকে থাকা দিকটায় বাসা বানায় হোটজিন। ঘুরে বেড়ানোর সময় যদি কোন বিপদের হুমকি আসে, আস্তে করে বাকল ছেড়ে দেয় শিশু পাখি। দশ ফুট নিচের পানিতে পড়ে যায়। কোন অসুবিধে নেই তাতে, ছোটবেলা থেকেই মাছের মত সাঁতার কাটতে পারে এরা। শত্রু চলে গেলে আবার আঁকশির সাহায্যে গাছে উঠে আসে।

সাত

আমেরইনডিয়ানদের গাঁয়ে একটা খাঁড়ির ধারের উঁচু জায়গায় ডুরেলের কুঁড়ে। খাঁড়ির দিকে নেমে যাওয়া ঢালে দাঁড়িয়ে আছে বেশ কিছু বড় বড় গাছ, ডালগুলোয় এত বেশি স্প্যানিশ মস জন্মেছে দেখতে লাগে দাড়িওয়ালা বুড়ো মানুষের মত। এর সামান্য দূরে একটা ছোট্ট উপত্যকা মত জায়গা। একধারে কিছু আম আর পেয়ারার চারা লাগিয়েছিল কোন বুড়ো ইনডিয়ান, তাতে ফল

ধরে। এমনিতে শুকনো থাকে উপত্যকাটা, কিন্তু বর্ষাকালে ডুবে যায় ছয় ফুট পানির নিচে, রীতিমত একটা লেক হয়ে যায়। কুঁড়ের দরজা থেকে তখন দেখা যায় এক অপরূপ দৃশ্য। লেকের কিনারে বাতাসে দোলে নলখাগড়ার ডগা, পানিতে উল্টে উল্টে যায় জলপদ্মের পাতা। সকাল-বিকাল ভিড় করে নানা রকম পাখি আর জানোয়ার, খাবারের সন্ধানে আসে।

বিকেল বেলা আসে র‍্যাকুনেরা। পানির কিনারে গিয়ে নামে ব্যাঙ আর কাঁকড়া ধরার জন্যে। ফল খেতে আসে গেছো-শজারু, বিচিত্র-দর্শন ডুরুকুলি মাংকি–কাঠবিড়ালীর মত শরীর ওদের, বড় বড় গোল চোখ পেঁচার চোখের মত। হই-হট্টগোলের ওস্তাদ, অহেতুক চিৎকার করে। আরও নানা রকম জানোয়ার আর পাখি এসে ভিড় করে গাছগুলোতে কিংবা লেকের কিনারে।

এই লেকটাতে আস্তানা গেড়েছে মাত্র চার ফুট লম্বা এক কিশোর কেইম্যান। মাত্র শ'খানেক গজ দূরের খাঁড়িতে গিজগিজ করে ওর বিশালদেহী মুরুব্বীরা, সে যে কেন এসে এই অগভীর লেকে একাকী জীবন বেছে নিয়েছে মাথায় ঢোকে না ডুরেলের। সাদা-কালো শরীর, সবুজ চোখ।

লেকের স্থায়ী বাসিন্দা আছে আরও একজন, একটা মেয়ে জ্যাকানা পাখি। দিনভর জলপদ্মের পাতার ওপর দিয়ে হেঁটে বেড়ায় ওটা খাবারের সন্ধানে। কেইম্যানটাকে দুচোখে দেখতে পারে না, কারণ পাখির মাংসে অরুচি নেই এই সরীসৃপের। সারাক্ষণ তাকে তাকে থাকে কখন পাখিটাকে ধরে নাস্তা সেরে ফেলা যায়।

কেইম্যানটার বয়েস কম তো, অভিজ্ঞতা কম, নইলে প্রথম সুযোগেই জ্যাকানাকে ধরে ফেলতে পারত। সেদিন কুঁড়ের দরজায় বসে লেকের দিকে নজর রাখছেন ডুরেল। পানির কিনারের ঝোপ থেকে বেরোতে দেখলেন পাখিটাকে। পাতায় পাতায় হেঁটে পোকা খুঁজে বেড়াতে লাগল ওটা।

আরও একজন নজর রেখেছে তখন জ্যাকানার ওপর, কিশোর কেইম্যান। নাস্তা সারার আগ্রহ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। সামান্যতম ঢেউ না তুলে ডুবে গেল ওটা। শিকারের দিকে লক্ষ্য স্থির করে চোখ দুটো শুধু ওপরে ভাসিয়ে রেখে সাঁতরে চলল ওটা, সমস্ত শরীর পানির নিচে, মনে হয় চোখ দুটো যেন পিছলে সরে যাচ্ছে পানির ওপর দিয়ে। জ্যাকানা খাবার খোঁজায় মগ্ন। পোকামাকড়, ছোট মাছ, যাই চোখে পড়ছে, লম্বা ঠোঁট দিয়ে ঠোকর মেরে ধরে মুখে চালান করে দিচ্ছে। কেইম্যানটাকে দেখতে পায়নি। পানির নিচ দিয়ে যেভাবে যাচ্ছিল সেভাবেই যদি এগোত ওটা, একেবারে কাছে এসে হাঁ করে চেপে ধরত, তাহলে পালাতে পারত না পাখিটা কিন্তু অনভিজ্ঞ বলে অতিরিক্ত উত্তেজনায় কয়েক ফুট দূরে ভেসে উঠে টর্পেডোর মত ছুটে গেল।

দেখে ফেলল জ্যাকানা। তীক্ষ্ণ চিৎকার করে লাফিয়ে উঠল শূন্যে। বাতাসে ডানা ঝাপটে কয়েক গজ দূরে গিয়ে বসল আবার পদ্মপাতার ওপর। খুব দ্রুত কেইম্যানের কথা ভুলে গিয়ে আবার খাবার খুঁজতে লাগল।

ভেবে পেলেন না ডুরেল, লেকের একটা বিশেষ অংশের দিকে বেশি আগ্রহ কেন পাখিটার, বেশির ভাগ সময় ওদিকেই কাটায় রহস্যটার সমাধান না করে

আর থাকতে পারলেন না। গিয়ে খুঁজে বের করলেন নলখাগড়ার ভেতরে জ্যাকানার বাসা। তাতে ডিমও আছে চারটে। বেশ কিছুদিন আগেই পেড়েছে বোধহয়, তা দেয়া প্রায় শেষ, সেটা বুঝতে পারলেন তিনি দুদিন পর। কারণ সেদিন গিয়ে দেখেন ডিমগুলোর খোসা ভেঙে বাচ্চা বেরিয়ে গেছে। ঘণ্টা কয়েক পরে পদ্মপাতায় দেখতে পেলেন জ্যাকানা পরিবারকে, মা আর চারটে ছানা। কয়েক ঘণ্টায়ই বেশ চালাক-চতুর হয়ে গেছে ছানাগুলো। মায়ের পেছনে একসারিতে পাতার ওপর ঘুরে বেড়ায়।

এ দৃশ্য দেখে লোভ আরও বেড়ে গেল কেইম্যানের। পাখিগুলোকে ধরার চেষ্টা বাড়িয়ে দিল কয়েক গুণ। জ্যাকানা মাতাও ততদিনে অনেক সেয়ানা হয়ে গেছে, কারণ সে আর এখন একা নয়, সঙ্গে আছে চার-চারটে ছানা। ছানাগুলোকেও সতর্ক করে দিয়েছে। কেইম্যানকে কাছে আসতে দেখলেই এখন মায়ের সঙ্গে গলা মিলিয়ে চিৎকার করে ওঠে, উড়তে শেখেনি, তাই বলে কি মারা পড়বে? আত্মরক্ষার কৌশল রপ্ত করে ফেলেছে ঠিকই। কেইম্যানটা বেশি কাছে চলে এলে ডাইভ দিয়ে পড়ে পানিতে, পদ্মপাতার নিচে অদৃশ্য হয়ে যায়, কয়েক মুহূর্ত পরেই দেখা যায় তীরে উঠে পড়েছে। কেইম্যানের আওতার বাইরে।

শিকার ধরার যত রকম কৌশল আছে সব প্রয়োগ করতে লাগল কেইম্যান। পানিতে সমস্ত শরীর ডুবিয়ে চোখ দুটোকে শুধু ভাসিয়ে রেখে কাছে যাওয়ার চেষ্টা করল। পারল না। শ্যাওলার নিচে আত্মগোপন করে খুব ধীরে ধীরে এগিয়ে দেখল। কাজ হলো না। ঘন শ্যাওলা আর পদ্মপাতার নিচে লুকিয়ে থেকে চোখ দুটো শুধু ভাসিয়ে রেখে ঘাপটি মেরে থাকল, পাখিগুলোর কাছে গেল না, আশা করল ওরাই তার কাছে আসবে। এল না ওরা। তীরের কাছাকাছি পানিতে ভেসে থাকল। ভাবল, ওকে কিনারে দেখলে বেশি পানিতে খাবার খুঁজতে যাবে ওগুলো, তখন কোন এক সুযোগে ছুটে গিয়ে ওদের ধরে ফেলা যাবে। এতেও কাজ হলো না। ওকে একধারে দেখলে অন্যধারে চলে যায় পাখিগুলো। পুরো একটা হপ্তা ধরে পাখিগুলোর পেছনে লেগে রইল কেইম্যান। একটা পাখিকেও ধরতে পারল না।

একদিনের কথা। সেদিন বেশ গরম পড়েছে। দুপুরের প্রচণ্ড গরমের সময় লেকের মাঝখানে ভেসে রইল সে আস্তে আস্তে চক্কর দিচ্ছিল একই জায়গায়, নজর রাখছিল চারদিকে। বিকেলের দিকে ধীরে ধীরে সরে গেল তীরের দিকে, একটা বড় ব্যাঙ চোখে পড়েছে, পদ্মপাতায় বসে রোদ পোহাচ্ছে ব্যাঙটা। ধরে গিলে ফেলল ওটাকে। সন্তুষ্ট হয়ে এগিয়ে গেল সবুজ শ্যাওলা যেদিকে ঘন হয়ে জন্মেছে সেদিকটায়, কিছু জলজ ফুল আছে সেখানে। ফুলগুলোর মাঝখানে গিয়ে হারিয়ে গেল।

ফিল্ড-গ্লাস চোখে লাগিয়ে আতিপাতি করে খুঁজলেন ডুরেল। পুরো দশটা মিনিট লাগল ওটাকে খুঁজে বের করতে। ফুল আর শ্যাওলার মাঝে এমন করে আত্মগোপন করে আছে যে প্রায় দেখাই যায় না, চোখ আর নাকের ফুটো দুটো কোনমতে নজরে পড়ে। লম্বা মাথাটা ঢাকা পড়েছে শ্যাওলার নিচে, চোখের সামনে কয়েকটা ফুল, নাকের বেশির ভাগটাই ঢেকে আছে পাতায়।

আধঘণ্টা পর এসে হাজির হলো জ্যাকানারা, শুরু হলো খেলা। প্রতিদিনের মতই আকস্মিক ভাবে নলখাগড়ার বন থেকে উদয় হলো মা-জ্যাকানা, মনে হলো যেন পানি ফুঁড়ে বেরোল। পাতার ওপর দাঁড়িয়ে ভালমত দেখল কোন বিপদ আছে কিনা। পেছন ফিরে ডাক দিল। ছোট ছোট চারটে খেলনার মত বেরিয়ে এল চারটে ছানা। ওদের নিয়ে পদ্মপাতার ওপর দিয়ে অভিযানে বেরোল মা।

পাতার ওপর দাঁড়িয়ে লম্বা ঠোঁটটা বাড়িয়ে দেয় মা, নিপুণভাবে উল্টে ফেলে কিনারটা, দেখে ওখানে কোন পোকা আটকে আছে কিনা। থাকলে ঠোকর মেরে তুলে নেয়। অনেক সময় দেখা যায় বেশ কিছু ছোট পোকা, কুঁচো চিংড়ি কিংবা খুদে শামুক পাতা কামড়ে আছে। ডাক দেয় তখন ছানাগুলোকে। সবাই মিলে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে তার ওপর। ঠুকরে ঠুকরে খায়। পাতার নিচের সব খাবার সাফ করে দিয়ে আবার এগোয় আরেকটা পাতার দিকে।

ছানা নিয়ে মা-জ্যাকানাকে ক্রমশ কেইম্যানটার দিকে এগোতে দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন ডুরেল। প্রচুর খাবার মেলে বলে ওদিকটাতে পাখিটার আনাগোনা বেশি। কেইম্যানটাও ঠিক ওখানেই এসে ঘাপটি মেরে আছে। গত কয়েক দিনে জ্যাকানার সতর্কতার প্রতি আস্থা জন্মে গিয়েছিল তাঁর, ভেবেছেন শেষ মুহূর্তে ঠিকই দেখে ফেলবে কেইম্যানকে কিন্তু দৃষ্টি যেন ভোঁতা হয়ে গেছে সেদিন জ্যাকানার। এগিয়েই চলেছে।

পাখিটাকে সতর্ক করে দেয়ার চেষ্টা করলেন তিনি। হাততালি দিলেন। চিৎকার করলেন। কিন্তু বিন্দুমাত্র কান দিল না জ্যাকানা, মানুষ দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। সে তার পরিবার নিয়ে খাবার খোঁজায় ব্যস্ত। আর কোনভাবে ওটাকে সাবধান করা যায় কিনা ভাবতে লাগলেন, কিন্তু কোন উপায় দেখতে পেলেন না। লেকের অন্য প্রান্তে রয়েছে ওটা, কাছে যেতে হলে ঘুরে যেতে হবে, সময় লাগবে তাতে, এবং ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যাবে। পাথর ছুঁড়েও লাভ নেই, অতদূরে নিতে পারবেন না পাথর।

কেইম্যানের বিশ ফুটের মধ্যে চলে গেছে মা-পাখিটা। ভাগ্যের হাতে ওটাকে ছেড়ে দিয়ে ফিল্ড-গ্লাস চোখে ঠেসে ধরে অপেক্ষা করতে লাগলেন তিনি। দরদর করে ঘামছেন। রাগে বকতে লাগলেন কেইম্যানটাকে, 'আমার জ্যাকানার যদি একটা পালকও খসে, তোকে আমি গুলি করে মারব ব্যাটা কুমিরের বাচ্চা কুমির!'

মনে পড়ল শটগানটার কথা। কিন্তু ওটা দিয়েও খুব একটা সুবিধে হবে না। এত দূরে লাগাতে পারবেন না কেইম্যানটাকে, বরং ছররা ছড়িয়ে গিয়ে খুন করতে পারে জ্যাকানা আর তার ছানাগুলোকে ফাঁকা আওয়াজ করে ভয় দেখানোর কথা ভাবলেন। গুলির আওয়াজে ভয় পেয়ে পালাতে পারে জ্যাকানা।

ছুটে ঘরে ঢুকলেন তিনি। কিন্তু কার্তুজগুলো কোথায় রেখেছেন মনে করতে পারলেন না। দীর্ঘ দুটো মিনিট ব্যয় করে ফেললেন খোঁজাখুঁজি করতে

গিয়ে, টানটান হয়ে উঠল স্নায়ু। অবশেষে খুঁজে পেলেন বাক্সটা। থাবা দিয়ে একটা কার্তুজ তুলে নিয়ে চেম্বারে ভরে বেরিয়ে এলেন বাইরে। বন্দুকটা বগলে চেপে, ট্রিগারে আঙুল ঢুকিয়ে, নলের মুখটা মাটির দিকে করে আরেক হাতে ফিল্ড-গ্লাস চোখে ঠেকালেন।

যে শ্যাওলার গাদার মধ্যে লুকিয়ে আছে কেইম্যানটা, তার কিনারে পৌঁছে গেছে জ্যাকানা। মাত্র একটা পাতা পেছনে আছে তার একটা ছানা, বাকিগুলো সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটার পেছনে আরেকটা। ঠোঁট নামিয়ে একটা পাতার কিনার চেপে ধরল মা-জ্যাকানা, উল্টে ফেলল। ছানাগুলোকে ডাকবে, ঠিক এই সময় চার ফুট দূর থেকে আক্রমণ করে বসল কেইম্যান। আচমকা মাথা তুলে তীরবেগে ছুটে এল পাখিটার দিকে। ঠিক সেই মুহূর্তে ট্রিগারে চেপে বসল ডুরেলের আঙুল। গুলি ফোটার বিকট শব্দে থরথর করে কেঁপে উঠল লেক এলাকা, প্রতিধ্বনি তুলল গাছে গাছে বাড়ি খেয়ে।

গুলির শব্দে, নাকি কেইম্যানকে দেখে কে জানে, বুঝতে পারলেন না ডুরেল, লাফ দিয়ে শূন্যে উঠে পড়ল পাখিটা। দেখলেন, মুহূর্ত আগেও যেখানে ছিল ওটা, সেখানে এসে চোয়াল দুটো বন্ধ হলো কেইম্যানটার, পাতাটাকে দু'টুকরো করে দিল। মাথার ওপর ডানা ঝাপটাচ্ছে জ্যাকানা। অসাধারণ ক্ষিপ্রতায় আবার মুখ তুলে চোয়াল ফাঁক করে ওটাকে ধরার চেষ্টা করল কেইম্যান, একচুলের জন্যে পারল না। বুনো চিৎকার করতে করতে নিরাপদ দূরত্বে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল পাখিটা। এত দ্রুত ঘটে গেল ঘটনাটা, নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে ব্যস্ত হতে হলো, ছানাগুলোকে লুকানোর নির্দেশ দিতে পারল না। দিশেহারার মত ইতিউতি তাকাতে লাগল পাতার ওপর কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে।

বড়টাকে ধরতে না পেরে ছানাগুলোর দিকে তেড়ে গেল কেইম্যান। কিন্তু সে কাছে পৌঁছার আগেই পানিতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে ডুব দিল ওগুলো। সেও ডুব দিল ওদের পেছনে।

উদ্বিগ্ন হয়ে তাকিয়ে রইলেন ডুরেল। পানির ওপরটা শান্ত হয়ে এসেছে। মা জ্যাকানাটা উত্তেজিত কণ্ঠে ডেকে ডেকে বেড়াতে লাগল পদ্মপাতার ওপর চলে গেল নলখাগড়ার বনের দিকে, ঢুকে গেল ভেতরে।

সেদিন আর ওটাকে দেখতে পেলেন না ডুরেল। ছানাগুলোও গায়েব। এমনকি কেইম্যানটাও। বাকি দিনটা অপেক্ষা করে রইলেন তিনি। মনের চোখে কল্পনা করলেন ভয়াবহ এক দৃশ্য–পালকে মোড়া তুলতুলে দেহগুলোকে পানির নিচে গপাগপ গিলে নিচ্ছে কুমিরটা। যতই ভাবলেন, রাগে অন্ধ হয়ে গেলেন তিনি, ওটাকে মারার জন্যে নানা পরিকল্পনা করতে লাগলেন।

পরদিন সকালে আর থাকতে না পেরে নলখাগড়ার বনে জ্যাকানার বাসার কাছে গিয়ে উঁকি দিলেন। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন মা আর ছানাগুলোকে দেখে, একটা ছানা কম, তারমানে ওটা কেইম্যানের পেটে গেছে। তিনি ভেবেছিলেন এতবড় একটা ঘটনার পর লেকের ছায়া মাড়াবে না আর পাখিটা, কিন্তু বড়ই বেহায়া, প্রতিদিনের মত ঠিকই বেরিয়ে এল নলখাগড়ার বন

থেকে। পদ্মপাতায় খাবার খুঁজে বেড়াতে লাগল।

সারাটা দিন ধনুকের ছিলার মত টানটান উত্তেজনা নিয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। কেইম্যানের দেখা নেই। প্রতি মুহূর্তে মনে হতে লাগল এই বুঝি পানির নিচ থেকে ভুস করে মাথা তুলে কামড়ে ধরল একটা পাখিকে। রোজ রোজ স্নায়ুর ওপর এই অত্যাচার আর সওয়া যায় না। বিকেলের দিকে এতটাই অসহ্য হয়ে উঠলেন, গাঁয়ে গিয়ে একটা ক্যানু ধার করে নিয়ে এলেন। দুজন ইনডিয়ান নৌকাটা বয়ে এনে নামিয়ে দিল লেকের পানিতে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে তখন। টর্চ, দড়ি আর একটা লাঠি হাতে লেকের পানিতে কেইম্যানটাকে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন তিনি।

খুঁজে বের করতে একটা ঘণ্টা লেগে গেল। কয়েকটা পদ্মপাতার মধ্যে স্থির হয়ে ভেসে আছে। টর্চের আলোয় বড় বড় চোখ দুটো চুনি পাথরের মত জ্বলছে। দড়ির মাথায় ফাঁস তৈরি করে রেখেছেন আগেই, অতি সাবধানে এগিয়ে গিয়ে আলতো করে নামিয়ে দিলেন মুখের কাছে। আলোর দিকে সম্মোহিতের মত তাকিয়ে আছে ওটা। নড়ছে না। এই সুযোগে মাথার ওপর দিয়ে টেনে এনে ফাঁসটা আটকে দিলেন গলায়। এতক্ষণে নড়ল কেইম্যান। শরীর মুচড়ে, ঝাঁকি দিয়ে, লেজের ঝাপটা মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করতে লাগল। নৌকায় তুলে আনলেন। দড়ির ফাঁস খুলতে গেলে তাঁর হাতে কামড়ে দেয়ার চেষ্টা চালাল ওটা।

পরদিন সকালে কেইম্যানটাকে একটা বস্তায় ভরে নৌকায় করে পাঁচ মাইল দূরের এক গভীর খাঁড়িতে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে এলেন। লেকটার প্রতি যত আকর্ষণই থাক, কোনমতেই পথ চিনে আর ফিরে আসতে পারবে না। কুঁড়ের দরজায় বসে তাঁকেও আর ভয়ে ভয়ে থাকতে হবে না পাখিগুলোর বিপদের আশঙ্কা করে। দমকা বাতাস ঝাপটা দিয়ে শিরশিরানি তুলে যাবে লেকের পানিতে, উল্টে দেবে পদ্মপাতা, নির্ভয়ে, মহানন্দে খাবার খুঁজে বেড়াবে তাতে মা-জ্যাকানা আর তার ছানারা, তিনিও দেখবেন মজা করে। ভাবলেন, আহ্, পৃথিবীটা যদি এমনি করে বিপদশূন্য হয়ে যেত, নির্ভয়ে বসবাস করত এর সমস্ত প্রাণীকুল, তাহলে কতই না মজা হত! ওই মুহূর্তে একটি বারের জন্যে মনে পড়ল না তাঁর, লেকটা পাখিগুলোর জন্যে বিপদমুক্ত হলেও লেকের আরও অসংখ্য খুদে জীবের জন্যে মোটেও তা নয়, ওগুলোর সবচেয়ে বড় বিপদ ওই নিরীহ পাখিটাই, আর ওর ছানাপোনারা, কারণ ওগুলোকে ধরে ধরে খাবে ওরা।

আট

প্যারাগুয়ের রিভার প্যারাগুয়ে থেকে অ্যাণ্ডিজ পর্বতমালার পাদদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ঘাসে ঢাকা বিশাল এক সমভূমি আছে, নাম চ্যাকো। বছরের অর্ধেক

সময় কড়া রোদে শুকিয়ে হাড়ের মত খটখটে হয়ে যায় এই তৃণভূমি, বাকি অর্ধেক সময়, শীতকালে, প্রবল বর্ষণের ফলে বন্যায় তলিয়ে যায় তিন-চার ফুট পানির নিচে। ব্রাজিলের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বন আর আর্জেন্টিনার তৃণ-অঞ্চল পামপার মাঝামাঝি এর অবস্থান হওয়ায় দুটোরই প্রভাব পড়েছে এর ওপর। আজব এই ঘাসবনে জন্মে পাম গাছ, কাঁটাঝোপে ফোটে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বনের ফুল। বড় বড় গাছ জন্মে তৃণভূমিতেও, ঘন বনের গাছের মত সেসব গাছের ডালে দোলে স্প্যানিশ মস।

রিভার প্যারাগুয়ের তীরে ছোট্ট এক শহরে হেডকোয়ার্টার করলেন ডুরেল। এখান থেকে দেশের গভীরে চলে গেছে চ্যাকো রেলওয়ে। মান্ধাতা আমলের ইঞ্জিন আর রেল-ব্যবস্থা, মাত্র দুই ফুট চওড়া লাইন চলে গেছে সেই ফোর্ড এইটস পর্যন্ত। বিপজ্জনক ভঙ্গিতে দোল খেয়ে ঝিকঝিক ঝিকঝিক করতে করতে প্রচুর কালো ধোঁয়া উড়িয়ে এগিয়ে চলে কয়লার ইঞ্জিন, টেনে নিয়ে যায় আদিম চেহারার বগিগুলোকে। তারই একটাতে চেপে একদিন জঙ্গলের ভেতর দুর্লভ প্রাণী খুঁজতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি।

লাইনটা যেখান দিয়ে গেছে ওই অঞ্চলের ওটাই একমাত্র উঁচু জায়গা, বনের প্রাণীরাও তাই চলাচলের জন্যে ওটাকে পথ হিসেবে বেছে নিয়েছে। তাতে সুবিধে হলো ডুরেলের। রেলের বগিতে ভ্রমণ করার সময় দুধারে অসংখ্য বুনো প্রাণী দেখার সুযোগ পেলেন। শত শত পাখি দেখলেন লাইনের ধারের গাছপালা আর ঝোপে। গাছের ডালে লাফালাফি করছে ঠোঁটের নিচের অদ্ভুত থলেওয়ালা টুকান পাখি। ধূসর বনমোরগের মত দেখতে সেরিমাস পাখি খাবার খুঁজে বেড়াচ্ছে ঘাসবনে। অসংখ্য সাদা-কালো ফ্লাই-ক্যাচার আর হামিং-বার্ড দেখা গেল। লাইনের ওপর বসে থাকা আরমাডিল্লো ট্রেনের শব্দকে ভয় করে না, ইঞ্জিন খুব কাছে চলে গেলে অলস ভঙ্গিতে সরে গিয়ে নেমে যায় পাশের ঝোপে। আরও নানা রকমের জীব দেখা গেল একটা কেশরওয়াল নেকড়েকেও দেখতে পেলেন ডুরেল।

গন্তব্যে পৌঁছার কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রথম জানোয়ারটা পেয়ে গেলেন তিনি, একটা থ্রী-ব্যাণ্ডেড আরমাডিলো। স্থানীয় লোকেরা খবর পেয়েছে বুনো প্রাণী সংগ্রহ করতে এসেছেন এক 'পাগলা ইংরেজ', জানোয়ার পেলেই কিনে ফেলে। নগদ টাকা কে না চায়। অন্য কাজকর্ম ফেলে রেখে জানোয়ার ধরতে লেগে গেল অনেকেই।

সবচেয়ে সহজে ধরা পড়ে থ্রী-ব্যাণ্ডেড আরমাডিলো। অরেঞ্জ আরমাডিলোও বলা হয় এগুলোকে; তার কারণ ভয় পেলেই শরীরটাকে গুটিয়ে গোল কমলে ফেলে এরা, কমলার আকৃতি হয়ে যায়। আরমাডিলো পরিবারের এটাই একমাত্র প্রাণী, যারা দিনে বেরোয়। ধরা একেবারে সহজ। ঢিল মারলে কিংবা সামনে গিয়ে জোরে এক হাঁক দিলেই নিজেকে গুটিয়ে ফেলে, পড়ে থাকে চুপচাপ। ব্যস, গিয়ে তখন তুলে নিয়ে থলেতে ভরে ফেললেই হলো।

গাউচোদের মত প্যারাগুয়ের মানুষও আরমাডিলো খায়। শক্ত খোসাটাকে ঝুড়ির মত ব্যবহার করে টুকটাক জিনিস বহন করা যায়। খোসা দিয়ে

একধরনের গিটারও বানানো যায়। এত কাজে লাগে বলে মানুষের হাতে মারা পড়ে এরা পাইকারি হারে। তবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার ভয় নেই, প্রচুর জন্মায়।

যেহেতু বছরের অর্ধেক সময় পানির নিচে থাকে, শুকনো মৌসুমেও পানি সরতে না পেরে জমে গিয়ে চ্যাকোর অনেক জায়গায় জলাভূমি সৃষ্টি হয়। সেখানে বাস করে উভচর প্রাণী আর সরীসৃপ। একধরনের ব্যাঙ পাওয়া যায় যার নাম হর্ন টোড বা শিংওয়ালা ব্যাঙ, আদিবাসীরা যমের মত ভয় পায় এগুলোকে। অনেক বড় হয় এই ব্যাঙ, ডুরেল একটা ধরেছিলেন বাসনের সমান বড়। কালো আর মাখন রঙের পটভূমিতে পান্না-সবুজ রঙ চামড়ার। বিশাল এক মুখ, ছড়ানো পেটের একপাশ থেকে আরেক পাশে চলে যায়। দুই চোখের পাশ থেকে চামড়া পিরামিডের মত চোখা হয়ে উঠে গেছে, মনে হয় শিং। ভয়ানক বদমেজাজী। শিং আর চোখ দুটো কেবল ভাসিয়ে সারাটা দিন কাদার মধ্যে শরীর ডুবিয়ে বসে থাকে। এ সময় কেউ বের করে আনার চেষ্টা করলেই তাকে আক্রমণ করে বসে, সে যত বড় প্রাণীই হোক। সেই সঙ্গে এমন জোরে চিৎকার করে, বিশ্বাস হতে চায় না এত বিকট শব্দ একটা ব্যাঙের গলা থেকে বেরোচ্ছে।

আদিবাসীদের বিশ্বাস, এগুলো ভূতুড়ে ব্যাঙ, মারাত্মক বিষাক্ত। বিদঘুটে চেহারা আর উদ্ভট আচরণই এ সব বিশ্বাসের কারণ, আসলে কিন্তু মোটেও বিষাক্ত নয় জীবটা। সেটা বুঝিয়ে দিয়ে ওদের ভয় ভাঙানোর চেষ্টা করতে গিয়ে উল্টো ওদের হাসির খোরাকে পরিণত হলেন ডুরেল। একটা ব্যাঙকে ধরে বিষ নেই এটা দেখানোর জন্যে মুখের ভেতর আঙুল ঢুকিয়ে দিলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে মুখ বন্ধ করে ফেলল ওটা। তাঁর মনে হলো দরজার ফাঁকে চাপা পড়েছে আঙুল। আকারের তুলনায় চোয়ালের অস্বাভাবিক জোর দেখে অবাক হয়ে গেলেন তিনি। অনেক কষ্টে প্রায় মিনিটখানেক চেষ্টার পর চোয়াল সামান্য ফাঁক করে কোনমতে আঙুলটা বের করে আনলেন। কালশিরা পড়ে গেল, ফুলে গেল জায়গাটা। ব্যথা আর দাগ দূর হতে পুরো একদিন লেগে গেল। এরপর থেকে হর্ন টোডের ব্যাপারে সাবধান হয়ে গেলেন তিনি।

ওখানকার জলাভূমির আরেকটা বিচিত্র ব্যাঙ বাজেটস ফ্রগ। অনেকটা হর্ন টোডের মতই দেখতে, প্রজাতিগত মিলও রয়েছে। একই রকম ভোঁতা মুখ, বিশাল হাঁ, আর খাটো পা; মাথায় শিংও আছে। তবে গায়ের রঙ অন্যরকম, চকলেট-ব্রাউন চামড়া, পেটের রঙ সাদাটে হলুদ। কাদার ধারেকাছে যায় না, পানিতে থাকতে ভালবাসে। জাতভাই হর্ন টোডের মতই বদমেজাজী, ভয় পেলে কিংবা বিরক্ত হলে শরীরটাকে ফুলিয়ে বেলুনের মত করে ফেলে আদিবাসীরা বলে, বেশি রেগে গেলে ফুলতে ফুলতে নিজের পেটই ফাটিয়ে দিয়ে মরে যায় এরা। ডুরেল অবশ্য এ রকম কাণ্ড ঘটতে দেখেননি।

যেখানে ব্যাঙ বেশি সেখানে সাপ বেশি থাকবে, এটা জানা কথা। কারণ সাপের প্রিয় খাদ্য হলো ব্যাঙ। নানা প্রজাতির সাপ আছে চ্যাকোতে। শুকনো অঞ্চলে বাস করে মারাত্মক বিষাক্ত র‍্যাটল স্নেক, ঝোপঝাড়ে ট্রি স্নেক, আর পানিতে ওয়াটার স্নেক। ঝোপ আর পানিতে যারা বাস করে, তাদের রঙ খুব

গাঢ় আর উজ্জ্বল।

ওখানে যে কয় প্রজাতির সাপ ধরেছেন ডুরেল, তার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর হলো হুডেড স্নেক। গাঢ় ব্রোঞ্জ রঙের শরীরে কালো কালো দাগ। রেগে গেলে এমন করে ফণা তোলে, মনে হয় মাথায় হেলমেট পরানো। বিষ আছে, তবে অতটা মারাত্মক নয় ব্যাঙ আর ইঁদুর খেয়ে বাঁচে, বাগে পেলে দু'চারটা ছোট পাখিকে গিলে ফেলতেও দ্বিধা করে না।

আরেক জাতের সুন্দর সাপ আছে ওখানে, কোরাল স্নেক। সারা গায়ে কুচকুচে কালো আর টকটকে লাল অসংখ্য আঙটি পরানো যেন—একটা লাল আঙটি, তারপর কালো আঙটি, আবার একটা লাল, আবার একটা কালো, এ ভাবেই চলে মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত। র‍্যাটলের মতই বিষাক্ত।

আর আছে অজগর গোত্রের সেই দানব, অ্যানাকোণ্ডা, আফ্রিকার পাইথনের যেটা জাতভাই। শিকারকে পেঁচিয়ে ধরে পিষে ভর্তা বানিয়ে মারে। ভয়াবহ সব রোমাঞ্চকর কাহিনী শোনা যায় এদের নিয়ে, যার বেশির ভাগই বানানো। আসলে সাপটার বিশাল আকৃতিই এ সব গল্পের উপকরণ জোগায়। পঁচিশ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয় একেকটা। সবচেয়ে লম্বা হয় অবশ্য এদের আরেক জাতভাই মালয়ের অজগর, বত্রিশ ফুট লম্বাও দেখা গেছে। না খোঁচালে মানুষকে আক্রমণ করে না অ্যানাকোণ্ডা। তবে একবার করে বসলে সেটার পরিণতি খুব খারাপ হতে পারে। গায়ে শক্ত কামড় বসিয়ে দ্রুত পেঁচিয়ে ফেলে শত্রুর শরীর, চাপ দিতে থাকে সাংঘাতিক শক্তিতে, বুকে-পিঠে চাপ দিয়ে দম আটকে দেয়। সাহায্য করার জন্যে কাছাকাছি কেউ না থাকলে ওর সেই মারণ-পাক থেকে বেরিয়ে আসাটা বড় কঠিন।

চ্যাকোর জলাভূমিতে পানি যেখানে বেশি সেখানে ওদের বাস। একদিন এক স্থানীয় চাষী খবর নিয়ে এলো ডুরেলের কাছে, আগের রাতে তার মুরগীর খোঁয়াড়ে হামলা চালিয়ে দুটো মুরগী ধরে নিয়ে গেছে এক অ্যানাকোণ্ডা। চিহ্ন ধরে ধরে গিয়ে দেখে এসেছে খোঁয়াড়ের পেছনের ঘাসবন মাড়িয়ে ওটা চলে গেছে জলাভূমির দিকে। এতক্ষণে নিশ্চয় কোনখানে শুয়ে গিলে ফেলা মুরগী হজম করছে। ধরতে চাইলে এটাই উত্তম সুযোগ।

খবর শুনে আর দেরি করলেন না ডুরেল, তখনই ঘোড়ায় চেপে রওনা হলেন লোকটার সঙ্গে। জলাভূমির পাশ ঘুরে এগোলেন সাপটা যেদিকে গেছে সেদিকে। শুয়ে শুয়ে মুরগী হজম করছিল ওটা, মানুষ দেখার সঙ্গে সঙ্গে পানিতে নেমে সাঁতরে সরে যেতে শুরু করল। সাপটাকে চোখে না পড়লেও দূর থেকে পানিতে ঢেউ দেখেই অনুমান করে ফেললেন ডুরেল, কি ঘটছে। ঘোড়ায় চড়ে ওই জলাভূমিতে এগোনো সম্ভব নয়। লাফ দিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে, সাপ ভরার জন্যে যে বস্তাটা এনেছেন সেটা নিয়ে দৌড় দিলেন তিনি।

পানি থেকে উঠে ঘাসবনে ঢুকে গেল সাপটা। মাটি ওখানে নরম, কাদাই বলা চলে। ছপছপ করে কাদাপানি মাড়িয়ে সাপের পেছনে ছুটলেন তিনি। জলাভূমির কিনার থেকে যেখানে ঘন ঝোপ শুরু হয়েছে, সেখানে পৌঁছে ওটার

দেখা পেলেন, ঝোপের মধ্যে ঢুকে যাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে। একবার ওখানে ঢুকে গেলে আর ধরা সম্ভব নয়, অতিরিক্ত কাঁটার জন্যে মাথাই গলানো যাবে না। সুতরাং সঙ্গীর আসার অপেক্ষা না করে বস্তাটা হাত থেকে ছেড়ে দিয়ে খপ করে সাপের লেজ চেপে ধরলেন তিনি। এ ধরনের বড় জাতের সাপ ধরার এটাই সবচেয়ে ভাল উপায়, লেজ ধরে টেনে রেখে মাথার পেছনটা চেপে ধরা, যাতে নড়াচড়া বন্ধ করে দেয়, তবে এ কাজের জন্যে কম করে হলেও দুজন লোক দরকার–একজন লেজ ধরে রাখবে, আরেকজন মাথা। কিন্তু ডুরেল এখন একা। সুতরাং যা হবার তাই হলো। শুরু হলো সাপে-মানুষে লড়াই। সাপটা চেষ্টা করল সামনে এগিয়ে ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়তে, আর ডুরেল চান ওকে পেছনে সরিয়ে আনতে। বেশি বড় নয় ওটা, মাত্র নয় ফুট, ওর দানবাকৃতির মুরব্বীদের তুলনায় একেবারেই ছোট। তারপরেও সাপ হিসেবে অনেক বড় এটা, নয় ফুট কম কথা নয়।

কিছুতেই সামনে এগোতে না পেরে অন্য বুদ্ধি করল সাপটা। ঘুরে শরীর মুচড়ে মাথাটাকে এগিয়ে এনে কামড়ে দেয়ার চেষ্টা করতে লাগল। লাফ দিয়ে একবার এদিকে একবার ওদিকে সরে যেতে লাগলেন ডুরেল, লেজ ছাড়লেন না। আস্তে আস্তে পিছলে সরে যাচ্ছে লেজটা। হাতের আঙুল ব্যথা হয়ে গেছে তাঁর, টনটন শুরু হয়েছে। এ ভাবে আর বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারবেন না। অন্য কিছু করা দরকার। আচমকা লেজ ছেড়ে সাপটার ঘাড় সই করে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন সামনে, থাবা দিয়ে ধরে ফেললেন মাথার পেছনটা, ঘাসের ওপর চেপে ধরে রাখলেন। নার্ভ সেন্টারে চাপ পড়ায় অবশ হয়ে গেল সাপটার শরীর, নড়াচড়া বিশেষ করতে পারল না আর।

হাঁপাতে হাঁপাতে এসে পৌঁছল চাষী। তার সহায়তায় সাপটাকে বস্তায় ভরে ফেললেন ডুরেল। বসে জিরিয়ে নিলেন কয়েক মিনিট। তারপর ভারি বোঝা নিয়ে ফিরে চললেন ক্যাম্পে।

এ ধরনের বড় সাপ ধরলে প্রথমেই ভাল করে পরীক্ষা করে নিতে হয় সাপটাকে। এর অনেক কারণ। সহজে তো আর ধরা দেয় না, শক্তি প্রয়োগ করতে হয়, চাপাচাপিতে সাপটার কোন পাঁজর ভাঙল কিনা দেখতে হয়। তারপর দেখতে হয় জোঁক বা অন্য কোন পরজীবী কামড়ে আছে কিনা। সাপের গায়ে বাসা বাঁধে পরজীবীরা, সেগুলো খসানোর জন্যে কিছুই করতে পারে না ওরা। আঁশের নিচে পাতলা চামড়া কামড়ে থাকে সেসব পোকা। মাঝে মাঝে বংশ বৃদ্ধি করে এত বেড়ে যায়, আঁশই খসিয়ে দেয়, ঘা করে দেয় চামড়ায়। সেটা সাপের জন্যে ক্ষতিকর। সৌন্দর্য তো নষ্ট করেই, আরও নানা অসুবিধে সৃষ্টি করে।

সাপের গায়ে কোন পুরানো ক্ষত আছে কিনা দেখতে হয়। প্রতি বছর নতুন করে খোলস বদলায় সাপ। এ কাজ করতে গিয়ে ঘন ঘন শরীর মোচড়াতে হয় তাকে, অসাবধানে কাঁটাঝোপ বা ধারাল পাথরে লেগে তখন চামড়া কেটে যেতে পারে। অনেক সময় খোলসের খানিকটা মাথার কাছে আটকে গিয়ে চোখ ঢেকে দেয় সাপের। এতে চোখের ভীষণ ক্ষতি হয়

দীর্ঘদিন খোলস আটকে থাকলে চিরকালের জন্যে অন্ধ হয়ে যেতে পারে সাপ। সেজন্যে ধরার পর সাপকে পরীক্ষা করা প্রয়োজন। ওরকম কোন অসুবিধে থেকে থাকলে দেরি না করে সেগুলো সারানোর ব্যবস্থা করতে হয়, নইলে সুন্দর একটা নমুনা নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

নয়

আর্জেন্টিনায় জানোয়ার ধরতে গিয়ে সেবাস্টিয়ানের সঙ্গে পরিচয় হয় ডুরেলের। সে একজন গাউচো, অর্থাৎ কাউবয় বা গরুর রাখাল। উত্তর আমেরিকার কাউবয়দের মতই গাউচোরাও ইদানীং নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে, কারণ ধীরে ধীরে এখানকার ফার্ম বা ইসটানশিয়াগুলোও হয়ে পড়ছে অতিমাত্রায় যন্ত্রনির্ভর।

দুটো কারণে আর্জেন্টিনায় গিয়েছিলেন ডুরেল চিড়িয়াখানার জন্যে কিছু দুর্লভ জন্তু ধরা; আর সেই সঙ্গে কিছু জানোয়ারের সচল ছবি তোলা। বুয়েনাস এয়ারস থেকে পঁচাত্তর মাইল দূরে তাঁর এক বন্ধুর একটা ইসটানশিয়া আছে, প্রচুর বুনো জানোয়ারের ঝাঁস আশপাশের এলাকায়; বন্ধু তাঁকে চিঠি লিখে পনেরো দিন ওখানে থাকার আমন্ত্রণ জানালেন, সঙ্গে সঙ্গে সুযোগটা লুফে নিলেন ডুরেল।

গাঁয়ের ছোট স্টেশনে ডুরেলকে এগিয়ে নিতে এলেন তিনি। ধূলি-ধূসরিত এবড়ো খেবড়ো পথে গাড়ি চালাতে চালাতে দুঃখ প্রকাশ করে জানালেন, একটা জরুরী কাজ পড়ে গেছে, ডুরেলের সঙ্গে থাকতে পারবেন না, সেদিনই বুয়েনাস এয়ারস যেতে হবে তাঁকে। 'তবে আমি না থাকলেও কোন অসুবিধে হবে না আপনার,' বললেন তিনি সেবাস্টিয়ানের হাতে তুলে দিয়ে যাব আপনাকে।'

'সেবাস্টিয়ান কে?'

'আমার একজন গাউচো,' রহস্যময় কণ্ঠে বললেন বন্ধু, 'এখানে এমন কোন বুনো জানোয়ার নেই, যেটাকে সে চেনে না। আমার অবর্তমানে সে-ই ইসটানশিয়ার কর্তা, আপনার যা দরকার, শুধু চাইবেন, তার কাছে পেয়ে যাবেন।'

বাড়িতে এসে বারান্দায় বসে লাঞ্চ সারার পর বন্ধুটি বললেন, 'চলুন, সেবাস্টিয়ানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।'

ঘোড়ায় চড়ে রওনা হলেন দুজনে। সোনালি ঘাসে রোদ ঝলমল করছে। দিগন্ত বিস্তৃত এই তৃণভূমিকে এ অঞ্চলের লোকেরা বলে পামপা। জায়ান্ট থিসল নামে একধরনের কাঁটাঝোপ জন্মে আছে এখানে ওখানে, ঘোড়ার পিঠে বসা আরোহীর মাথা ছাড়িয়ে যায় ওগুলো। ঘাস বন মাড়িয়ে, ঝোপের ভেতর দিয়ে এগিয়ে ঘণ্টাখানেক পর ছোট একটা ইউক্যালিপটাস বনে পৌঁছুলেন

তাঁরা বনের মাঝখানে নিচু ছাতওয়ালা, সাদা রঙ করা, লম্বা একটা বাড়ি দেখা গেল। বিরাট এক বুড়ো কুকুর শুয়ে আছে রোদের মধ্যে বালিতে; সাড়া পেয়ে মুখ তুলে তাকিয়ে নিরাসক্ত গলায় খুক-খুক করল দুবার, আবার শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘোড়া থেকে নেমে ওদুটোকে খুঁটির সঙ্গে বাঁধলেন দুজনে।

'এ বাড়িটা সেবাস্টিয়ান নিজের হাতে বানিয়েছে,' বন্ধু বললেন, 'নাক ডাকাচ্ছে হয়তো এখন কোথাও শুয়ে।'

ঘুরে বাড়ির অন্যপাশে চলে এলেন দুজনে। সরু দুটো ইউক্যালিপ্টাস গাছে বাঁধা বিশাল এক হ্যামক, তাতে শুয়ে আছে সেবাস্টিয়ান।

প্রথম দর্শনে লোকটাকে বামন বলে মনে হলো ডুরেলের, পরে অবশ্য জেনেছেন যে অত খাটো সে নয়, পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চি, হ্যামকে কুঁজো হয়ে শুয়ে থাকার ফলে অত বেঁটে লেগেছে। তার লম্বা, শক্তিশালী দুটো হাত ঝুলে আছে হ্যামকের দুধারে, রোদে পোড়া মেহগনি কাঠের মত রঙ, হালকা সাদা রোমে ঢাকা চামড়া। ওর মুখ দেখতে পেলেন না, কালো একটা হ্যাট দিয়ে ঢাকা, নাক ডাকার তালে তালে ওঠানামা করছে সেটা। সে কি ভয়ঙ্কর শব্দ, বিকট গর্জনের মত, এমন নাক-ডাকা জীবনে শোনেননি ডুরেল।

সেবাস্টিয়ানের ঝুলে থাকা একটা হাত ধরে জোরে জোরে ঝাঁকাতে লাগলেন বন্ধু, একই সঙ্গে ঝুঁকে যতটা সম্ভব কানের কাছে মুখ নিয়ে চেঁচিয়ে ডাকলেন, 'সেবাস্টিয়ান! সেবাস্টিয়ান! ওঠো। দেখো কাকে নিয়ে এসেছি।'

সাড়া দিল না সেবাস্টিয়ান। হ্যাটের নিচে তার নাক ডাকানো চলছে সমান তালে।

ডুরেলের দিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকালেন বন্ধু। 'ও এই রকমই, ঘুমানোর সময় মরে থাকে। ওই হাতটা ধরুন, হ্যামক থেকে ফেলে দিতে হবে না হলে উঠবে না।'

দুহাত চেপে ধরে ওকে টেনে তুলে বসানো হলো। মুখের ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ে গেল হ্যাটটা, বেরিয়ে পড়ল গোল, বাদামী রঙের একটা ভোঁতা মুখ। তামাকের রসে লাল হয়ে যাওয়া একজোড়া পেল্লাই গোঁফ, দুটো তুষারশুভ্র ভুরু ছাগলের শিঙের মত বাঁকা হয়ে কপালের দিকে উঠে গেছে। প্রথমেই মাটিতে ফেলে না দিয়ে ওর কাঁধ চেপে ধরে ঝাঁকাতে লাগলেন বন্ধু, বার বার কানের কাছে চিৎকার করে নাম ধরে ডাকতে লাগলেন। ঘুমটা বোধহয় সামান্য পাতলা ছিল সেবাস্টিয়ানের, সেজন্যে ফেলে দেয়া লাগল না, ডাকাডাকিতেই চোখ মেলল অবশেষে। ঘুমজড়িত দুটো কালো চোখে কেমন শয়তানিভরা চাহনি, বন্ধুর দিকে তাকিয়ে তাঁকে চিনতে পেরে গর্জে উঠল, 'আরি, সেনিয়র!' তাড়াতাড়ি লাফ দিয়ে নামল হ্যামক থেকে।' 'আপনি এসেছেন, জানতেই পারিনি, দেখুন তো কি রকম শুয়োরের মত ঘুমাচ্ছিলাম! এটা একটা কাজ হলো! তবে এত তাড়াতাড়ি আসবেন ভাবতে পারিনি, নইলে জেগে থাকতাম।'

পরিচয় পাওয়ার ডুরেলের একটা হাত চেপে ধরে

মুচড়ে দিল সে, এটা তার হাত মেলানোর ধরন, আরেকটু হলে ব্যথায় ককিয়ে উঠতেন তিনি।

দরজার দিকে ফিরে গলা ছেড়ে হাঁক দিল সেবাস্টিয়ান, 'মারিয়া! মারিয়া!'

গর্জন শুনে বছর তিরিশেকের এক সুন্দরী মহিলা বেরিয়ে এল। সগর্বে তার সঙ্গে ডুরেলের পরিচয় করিয়ে দিল সেবাস্টিয়ান, ঘোষণা করল মহিলাটি তার স্ত্রী। ভালুকের মত এক থাবা বাড়িয়ে থপাৎ করে ফেলল ডুরেলের কাঁধে, খামচে ধরে আগ্রহের সঙ্গে তাকাল তাঁর মুখের দিকে। জিজ্ঞেস করল, 'সেনিয়র, কফি খাবেন, না মেট?'

আগেই ডুরেলকে সাবধান করে দিয়েছিলেন বন্ধু, কফি পছন্দ করে না সেবাস্টিয়ান, সুতরাং প্রথম পরিচয়েই সেটা খাওয়ার আগ্রহ দেখিয়ে ওর বিরাগভাজন হতে চাইলেন না ডুরেল। মেট হলো আর্জেন্টিনার ভেষজ গ্রীন-টি, সেবাস্টিয়ানের মতে চা হিসেবে এর কোন জুড়ি নেই। কফি হলো এক অতি জঘন্য পানীয়, খায় শহুরে মানুষ আর দুনিয়ার যত হতভাগা বোকা লোকেরা। সেবাস্টিয়ানের চোখে হতভাগা কিংবা বোকা কোনটাই হওয়ার ইচ্ছে নেই ডুরেলের, তাই মেটই খেতে চাইলেন।

উজ্জ্বল হলো সেবাস্টিয়ানের মুখ। স্ত্রীর দিকে ফিরে ধমকে উঠল, 'কি হলো, কানে শোনো না? মেট খেতে চাইছেন সেনিয়র সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকবেন নাকি সেনিয়ররা?'

'পানি বসিয়ে দিয়ে এসেছি,' শান্তকণ্ঠে জবাব দিল মহিলা, 'সেনিয়রদের বসতে দিলেই পারো, তাহলে আর দাঁড়িয়ে থাকা লাগে না।'

'ফের মুখে মুখে তর্ক!' গর্জে উঠল সেবাস্টিয়ান। থরথর করে কেঁপে উঠল তার গোঁফের ডগা।

'ওর কথায় কিছু মনে করবেন না, সেনিয়র,' হেসে বলল মারিয়া, 'মেহমান দেখলেই ওর মাথা গরম হয়ে যায়।'

বীটের মত লাল হয়ে গেল সেবাস্টিয়ানের মুখ। 'মাথা গরম! কার? আমি তো মরা ঘোড়ার মত শান্ত হয়ে আছি আপনারা বসুন, সেনিয়র, আমার মেয়েমানুষটার কথায় কিছু মনে করবেন না। শয়তানি বুদ্ধি ওর মগজে সারাক্ষণ গিজগিজ করে, পুরুষ হয়ে জন্মালে ভাল রাজনীতি করতে পারত।'

গাছের নিচে বসলেন ডুরেল আর তাঁর বন্ধু। কড়া ঝাঁঝাল দুর্গন্ধযুক্ত একটা ছোট সিগারেট ধরিয়ে টানতে টানতে অনর্গল কথা বলতে থাকল সেবাস্টিয়ান, 'আবার বিয়ে করাটা আমার মোটেও উচিত হয়নি, সেনিয়র। কিন্তু কি করব, আমার সঙ্গে বয়েসের পাল্লা দিয়ে কেউই টিকে থাকতে পারল না। চার-চারবার বিয়ে করেছি, সবাই আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। প্রতিবার কবরে শুইয়ে দিয়ে আসার সময় নিজেকে বোঝাই, সেবাস্টিয়ান, অনেক হয়েছে, আর না···তারপর হঠাৎ কি করে যে কি হয়ে যায়···আবার একটা বিয়ে করে বসি। মন ঠিকই থাকে আমার, কিন্তু শরীর কথা শোনে না, মন বলে একা থাকো, কিন্তু শরীর বলে···' ফোলা পেটের দিকে তাকিয়ে নাকমুখ কুঁচকে বিরক্তিতে মাথা নাড়ল সে, মুখ তুলে বিমল হাসি হেসে দেখিয়ে দিল

মাত্র দুটো ক্ষয়া দাঁত আছে সামনের দিকে, বাকি সমস্ত মাটাই খালি, 'শরীরের কাছে সব সময়ই দুর্বল হয়ে পড়ি আমি, সিনর···তবে যাই বলেন, মেয়েমানুষ ছাড়া পুরুষমানুষের বাঁচার কোন অর্থ হয় না, একেবারে মূল্যহীন।'

মেট নিয়ে এল মারিয়া। সেটা খাওয়ারও এক চমৎকার ব্যবস্থা। কোন কাপটাপ নেই। গোল পাত্রটা হাতে হাতে ঘুরতে থাকবে, একজন এক চুমুক খেয়ে পাত্রটা তুলে দেবে পরের জনের হাতে। এ ভাবেই চলবে যতক্ষণ না শেষ হয়। মেট খেতে খেতে ডুরেলের আগমনের উদ্দেশ্য সেবাস্টিয়ানকে জানালেন বন্ধু। ছবি তোলার কথা বলে যখন বললেন এর মধ্যে ওকেও একটা চরিত্রে অভিনয় করতে হতে পারে, গোঁফ চুমরে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল সেবাস্টিয়ান, 'অ্যাই বোকা মেয়েমানুষ, শুনলে তো, সিনেমায় অভিনয় করতে যাচ্ছি আমি। ইংল্যাণ্ডের হলে ছবি দেখে আমার জন্যে অস্থির হয়ে ছুটে আসবে ওখানকার সব মেয়েমানুষ। অতএব, খোয়াতে যদি না চাও, সাবধান।'

'ছুটে আসার আমি তো কোন কারণ দেখছি না,' শান্তকণ্ঠে বলল মহিলা, 'ওখানে নিশ্চয় স্বামীর আকাল পড়েনি। তা ছাড়া খুঁজলে সব দেশেই অকর্মা স্বামী পাওয়া যায়।'

তেড়া চোখে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে আবার ডুরেলের দিকে ফিরল সেবাস্টিয়ান, 'কিচ্ছু ভাববেন না, সেনিয়র, আপনার কাজে সব রকম সাহায্য আমি করব। যা চাইবেন তাই পাবেন।'

সেদিন বিকেলে বুয়েনাস এয়ারস রওনা হয়ে গেলেন বন্ধু। পরের দুটো হপ্তা আঠার মত ডুরেলের সঙ্গে লেগে রইল সেবাস্টিয়ান। অফুরন্ত কর্মশক্তি ওর। তিনি যা বলেন, সঙ্গে সঙ্গে পালন করতে লেগে যায়। কাজটা যত বেশি কঠিন হয়, ততই যেন আনন্দ পায় সে। নিজে যেমন খাটে, অন্যকেও খাটিয়ে নিতে পারে। ফার্মের যত ভাড়াটে কাজের লোক আছে, সবাইকে খাটায় সে মজার ব্যাপার হলো, নরম কথা বলে কিংবা ভদ্র ব্যবহার করে খাটায় না সে, কথায় কথায় ধমক মারে, অপমান করে, এবং আরও অবাক ব্যাপার হলো, তার এই ব্যবহারে রেগে যাওয়ার চেয়ে বরং হেসে লুটোপুটি খায় ওরা, কাজে আরও বেশি মনোযোগী হয়।

সারাক্ষণ হম্বিতম্বি করে কাজের লোকের ওপর, গজগজ করতে থাকে, 'ব্যাটারা, তোরা হলিগে গু-খেকো শামুক, পাখির গু দেখলে শামুক যেমন হুমড়ি খেয়ে পড়ে, আর গতর নাড়াতে চায় না, তোরাও হয়েছিস তেমনি···ঘোড়া আর তোদের ভয় পাবে কি, তোরাই তো ওগুলোকে দেখলে ভয়ে কাতর হয়ে যাস, কপাল থেকে তোদের খুলে আসা চোখ দেখে মায়া করেই আর ছোটে না ঘোড়া, ভাবে হেগেমুতে একাকার করে ফেলবি···আরে বোকা পাঁঠার দল, তোদের মাথায় মগজ আছে নাকি, সব কটার মগজ এক করলেও একটা ছারপোকার খাবার হবে না···'

তার এই উদ্ভট গালাগাল শুনে হাসে শ্রমিকরা, তবে কাজের গতি বাড়িয়ে দেয়। একটা কথা ওরা জানে এবং সেটাই এই ভাঁড়টার প্রতি ওদের শ্রদ্ধার কারণ–যে কাজ সে নিজে করতে পারবে না, সেকাজ অন্যকে দিয়ে করানোর

চেষ্টা করবে না। একটা প্রবাদই চালু হয়ে গেছে ওদের মধ্যে, কোন কাজকে যদি অসম্ভব বলে বোঝাতে চায়, বলে, 'সেবাস্টিয়ান যেটা করতে পারবে না।'

বিশাল একটা কালো ঘোড়ায় চড়ে, কাঁধে লাল-নীল পঞ্চো ছড়িয়ে দিয়ে, ল্যাসো হাতে টগ্‌বগ টগবগ ঘোড়া ছুটিয়ে ইসটানসিয়ার চারপাশে চক্কর দিয়ে বেড়ায় সে, সেসময় তার ভাবভঙ্গিই আলাদা। ল্যাসোর ফাঁস ছুঁড়ে কত রকম কায়দায় ছুটন্ত গরুকে ধরা যায়, সব ডুরেলকে করে দেখাল সে। ঘোড়া যত বেশি জোরে ছোটে, মাটি যত বেশি রুক্ষ আর এবড়ো-খেবড়ো হয়, গরু যত বেশি এলোমেলো দৌড়ায়, ততই যেন তার ল্যাসো ছোঁড়ার দক্ষতা বেড়ে যায়, বাতাসে শিস কেটে ছুটে যায় দড়ি, কোন্ গরুর সাধ্য আছে তার ফাঁসকে ফাঁকি দিয়ে ফসকে যায়।

আরও একটা জিনিস শোভা পায় তার হাতে, ছোট হাতল আর লম্বা চামড়ার ফালি লাগানো একটা চাবুক। ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে বসে ওই চাবুক মেরে নিখুঁত ভাবে কেটে ফেলতে পারে থিস্‌ল্ গাছের মাথা। লোকের ঠোঁট থেকে জ্বলন্ত সিগারেট চাবুকের ডগায় পেঁচিয়ে টান মেরে নিয়ে আসা তার কাছে নেহায়েত ছেলেখেলা। কে নাকি একজন সেবাস্টিয়ানের চাবুক ছোঁড়ার ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেছিল, আর যায় কোথায়, লোকটার শার্ট পিঠ থেকে চিরে খুলে ফেলেছিল সে, সামান্যতম ছোঁয়া লাগেনি পিঠের চামড়ায়। চাবুকটা সেবাস্টিয়ানের হাতে আরেকটা বাড়তি হাতের মত হয়ে গেছে। ছুরি আর কুড়াল ছোঁড়ায়ও ওস্তাদ সে। দশ ফুট দূর থেকে কুড়াল ছুড়ে মেরে একটা দেশলাইয়ের বাক্সকে দু'টুকরো করে দিতে পারে। ঘটে সামান্যতম ঘিলু আছে এমন কোন লোক সেবাস্টিয়ানকে শত্রু বানাতে চাইবে না।

ওকে নিয়ে বহুবার জানোয়ার ধরতে বেরিয়েছেন ডুরেল, বিশেষ করে রাতের বেলা। অন্ধকার নামার পর পর টর্চ হাতে ইসটানসিয়া থেকে বেরিয়েছেন দু'জনে, বেশি দেরি করতে হয়নি কোনদিনই, মাঝরাতের মধ্যেই ফিরে এসেছেন সঙ্গে অন্তত দুটো-তিনটে জানোয়ার নিয়ে। এ সময় ওর প্রিয় কুকুরটা অনেক সাহায্য করেছে। অতি সাধারণ একটা নেড়ি কুকুর, বয়েসের ভারে দাঁত ক্ষয়ে গিয়ে মাড়ীর কাছাকাছি চলে গেছে, কিন্তু দক্ষতার দিক দিয়ে মনিবের যোগ্য সহকারী ওটা। চমৎকার শিকারি। দাঁতে ধার না থাকায় আরও ভাল হলো, ডুরেল চান যে সব জানোয়ার ধরবেন ওগুলোর যাতে কোন প্রকার শারীরিক ক্ষতি না হয়। দাঁত ভোঁতা বলে কোন জানোয়ারকে কামড়ে ধরে আটকে রাখার সময় ইচ্ছে করলেও জখম করতে পারে না কুকুরটা। বেশির ভাগ সময় তাড়া করে নিয়ে গিয়ে কোথাও আটকে ফেলে পাহারা দেয় আর খানিক পর পর ডেকে উঠে জানান দেয় কোথায় আছে ওটা।

দেখে মনে হয় খোলা এই ঘাসবনে জানোয়ার ধরা বুঝি কত সহজ, কিন্তু ধরতে গিয়ে টের পেলেন ডুরেল, কি সাংঘাতিক কঠিন। বেশির ভাগ জানোয়ারই এখানে গর্তে বাস করে, রাতে বেরোয়। গাছপালা বিশেষ না থাকায় অনেক দূর থেকেই শিকারিকে দেখে পালায়। তার ওপর রয়েছে বিরক্তিকর প্লোভার পাখি, পামপার শিকারিরা দু'চোখে দেখতে পারে না

এদের। সাদা আর কালোতে মেশানো এই পাখিগুলো দেখতে বেশ সুন্দর, সব সময় জোড়ায় জোড়ায় থাকে। চোখের দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ আর বড় বেশি সন্দেহ প্রবণ। অস্বাভাবিক কিছু দেখলেই লাফ দিয়ে শূন্যে উঠে পড়ে মাথার ওপর ঘুরে ঘুরে উড়তে থাকে আর কর্কশ চিৎকার করে, টেরো! টেরো! টেরো! আশপাশের সমস্ত জানোয়ারকে সতর্ক করে দেয়।

বিশাল এই ঘাসের বনে সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে যে সব প্রাণী তার মধ্যে একটা হলো রোমশ আরমাডিলো। মাটিতে গর্ত খুঁড়ে বাস করে এরা। তিরিশ-চল্লিশ ফুট লম্বা সুড়ঙ্গ করে ফেলে। রাতের বেলা খাবারের সন্ধানে বেরোয়। কোন কারণে ভয় পেলে সোজা ছুট লাগায় গর্তের দিকে, ঝাঁপ দিয়ে পড়ে একবার গর্তে ঢুকে যেতে পারলে আর ওদের ধরা প্রায় অসম্ভব। এদের ধরার জন্যে সবচেয়ে উপযুক্ত সময় হলো অন্ধকার রাত। সঙ্গে টর্চ নিতে হবে, কুকুর থাকলে সুবিধে। গন্ধ শুঁকে সহজেই আরমাডিলোকে খুঁজে বের করে ফেলে কুকুর।

কয়েক প্রজাতির আরমাডিলো আছে দক্ষিণ আমেরিকায়, ওখানকার মানুষের প্রিয় খাবার। গাউচোরা আরমাডিলো ধরে বড় পিপায় মাটি ভর্তি করে তার মধ্যে রেখে দেয়। বিশেষ কোন অনুষ্ঠান কিংবা উৎসবের সময় রোস্ট করে খায়।

আরমাডিলো শিকার করতে গিয়ে এক রাতে সেবাস্টিয়ানের অস্বাভাবিক শক্তির পরিচয় পেলেন ডুরেল। গন্ধ শুঁকে একটা আরমাডিলোকে খুঁজে বের করল কুকুরটা, তাড়া করে কয়েকশো গজ নিয়ে যাওয়ার পর গর্তে ঢুকে পড়ল জানোয়ারটা। সেরাতে সেবাস্টিয়ান ছাড়াও ডুরেলের সঙ্গে ছিল আরও একজন লোক, ইসটানশিয়ার এক কর্মচারী। কুকুরের পেছন পেছন দৌড়ে গেলেন ডুরেল আর লোকটা, সেবাস্টিয়ান পড়ে রইল অনেক পেছনে—ঘোড়ায় চড়ে বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতে পারলেও দৌড়াতে তেমন পারে না সে, তার ফিগারটা দৌড়ানোর উপযুক্ত নয়। যাই হোক, আরমাডিলোটা গর্তে ঢুকে যাওয়ার আগের মুহূর্তে সেখানে পৌঁছালেন ডুরেল, লেজটা গর্তের ভেতর হারিয়ে যাচ্ছে দেখে মরিয়া হয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে চেপে ধরলেন। লোকটা চেপে ধরল পেছনের একটা পা। সামনের দুই থাবার বাঁকা নখগুলো বিঁধিয়ে দিয়ে মাটি আঁকড়ে রইল আরমাডিলো। যতই টানাটানি করেন দু'জনে, নড়াতে আর পারেন না, যেন সিমেন্টে গেঁথে দেয়া হয়েছে জানোয়ারটার পা। হঠাৎ শরীরটাকে এক ঝাড়া মেরে লোকটার হাত থেকে পা ছাড়িয়ে নিল আরমাডিলো। লেজ আর ধরে রাখতে পারছেন না ডুরেল, আঙুল ব্যথা হয়ে গেছে, পিছলে সরে যেতে শুরু করল সেটা। ঠিক এই সময় হাঁপাতে হাঁপাতে এসে পৌঁছল সেবাস্টিয়ান। এক ধাক্কায় ডুরেলকে সরিয়ে দিয়ে চেপে ধরল আরমাডিলোর লেজ। গর্তের দু'ধারে দুই পা ঠেকিয়ে শরীর বাঁকা করে টানতে শুরু করল। ভেতর থেকে ফোয়ারা হয়ে উড়ে আসতে লাগল মাটির কণা, তারপর বোতলের মুখের কর্কের ছিপির মত গর্তের ভেতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল আরমাডিলো। এতক্ষণ ধরে ডুরেল আর লোকটা মিলে টানাটানি

করেও যে কাজটা করতে পারেননি সেবাস্টিয়ান একাই সেটা সেরে ফেলল।

একদিন রিয়ার ছবি তুলতে চাইলেন ডুরেল। রিয়া হলো উটপাখির প্রজাতি, একধরনের স্থলচর পাখি, উড়তে পারে না, দক্ষিণ আমেরিকার উটপাখি বলা হয় এগুলোকে। ছুটতে পারে রেসের ঘোড়ার মত। দৃশ্যটা নাটকীয় ভঙ্গিতে মুভি ক্যামেরায় ধরে রাখতে চাইলেন তিনি—আদিম শিকারির মত ঘোড়ায় চেপে উটপাখিকে তাড়া করবে একজন মানুষ, তার হাতে থাকবে বলিয়াডোরা। জিনিসটা একধরনের অস্ত্র। ক্রিকেট বলের সমান তিনটে কাঠের বলকে কয়েক ফুট লম্বা তিনটে শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে দড়ির মাথাগুলোকে এক করে বাঁধা হয়। সেটাকে মুঠো করে ধরে মাথার ওপর ঘোরাতে ঘোরাতে শক্তি সঞ্চয় করে নিয়ে ছুঁড়ে মারা হয় পাখির পা লক্ষ্য করে। বলগুলো ঘুরতে ঘুরতে পায়ে দড়ি পেঁচিয়ে দেয়, পাখি আর ছুটতে পারে না, হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়।

সেবাস্টিয়ানকে বলতেই লাফিয়ে উঠল সে। শূটিঙের সমস্ত আয়োজন করে ফেলল। ক্যামেরার সামনে আসার লোভে সকাল সকালই উঠে সেদিন ভাল জামাকাপড় পরে ফেলল শ্রমিকেরা। কে কত রঙচঙে আর ঝলমলে পোশাক পরে অন্যকে হারাতে পারে এই প্রতিযোগিতায় মাতল যেন।

ঘোড়ার পিঠে বসে ওদের দিকে তাকিয়ে মুখ বাঁকাল সেবাস্টিয়ান, মাটিতে থু-থু ফেলে তিক্তকণ্ঠে বলল, 'ব্যাটাদের কাণ্ড দেখুন, সেনিয়র। দেখে মনে হচ্ছে কবুতরের ডিম একেকটা। আহা, কি একেকখান চেহারা, আবার সিনেমা করতে এসেছে। ওয়াক, থুহ্!'

কিন্তু আড়চোখে লক্ষ করলেন ডুরেল, ক্যামেরার সামনে আসার আগে পকেট থেকে চিরুনি বের করে পাকানো গোঁফজোড়াকে ভালমত আঁচড়ে নিল সে।

কড়া রোদের মধ্যে সারাটা দিন ছোটাছুটি করে বিকেলে যখন শেষ হলো শূটিং, সবাই ক্লান্ত, যে যেখানে পারল ঘাসের মধ্যেই চিত হয়ে শুয়ে পড়ল, কেবল সেবাস্টিয়ান বাদে। ছোটাছুটি সে-ই বেশি করেছে, কিন্তু দেখে মনে হয় না তার কোন ক্লান্তি আছে, সকালের মতই তাজা। বাড়ি ফেরার পথে ডুরেলকে জানাল, তাঁর সম্মানে একটা পার্টির আয়োজন করেছে সে। ইসটানশিয়ার সবাইকে দাওয়াত করেছে, সবাই যোগ দেবে। প্রচুর মদ আর নাচগানের ব্যবস্থা থাকবে। বলার সময় উত্তেজনায় চোখ চকচক করে উঠল তার। তার আনন্দ দেখে মুখ ফুটে আর বলতে পারলেন না ডুরেল যে তিনি বেজায় ক্লান্ত, রাত জাগা তো দূরের কথা, ঘরে গিয়েই বিছানায় গড়িয়ে পড়তে চান। আমন্ত্রণটা গ্রহণ করতেই হলো, কারণ এরপর আর পার্টি দেয়ার সময় পাওয়া যাবে না, আগামী দিন ভোরে উঠেই তিনি চলে যাচ্ছেন।

পার্টির আয়োজন করা হয়েছে ধোঁয়ায় ভরা বিশাল রান্নাঘরটায়, আধডজন কেরোসিনের বাতি জ্বেলে আলোর ব্যবস্থা হয়েছে। তিনটে গিটারও জোগাড় হয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে সে পার্টির হৃদয় এবং প্রাণ সব কিছুই হলো সেবাস্টিয়ান। সবার চেয়ে বেশি মদ গিলল সে, অথচ মাতাল হলো না,

গিটার বাজাল, খাবার খেল কয়েক গুণ বেশি। নাচল বুনো গাউচো নাচ। সে যে কি জিনিস, না দেখলে বোঝা যাবে না, অনুমান সম্ভব নয়। যেদিকে ইচ্ছে হাত-পা ছুঁড়ে, সামনে পেছনে লাথি মেরে, বাতাসে ঘুসি মেরে, ঘন ঘন বিরাট লাফ দিয়ে চাল ছোঁয়ার চেষ্টা চালাতে চালাতে ঘর কাঁপিয়ে নাচতে লাগল সে। তার বুটের নিচে বসানো লোহার কাঁটা পাথরের মেঝেয় ঘষা খেয়ে আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছুটাল।

পার্টির মাঝামাঝি সময়ে শহর থেকে এসে হাজির হলেন ডুরেলের বন্ধু। যোগ দিলেন পার্টিতে। ঘরের কোণে বসে গেলাসে চুমুক দিতে দিতে নির্বাক বিস্ময়ে সেবাস্টিয়ানের নাচ দেখতে লাগলেন ডুরেল।

তুঙ্গে উঠেছে পার্টি। হাততালি দিয়ে, হুল্লোড় করে সেবাস্টিয়ানকে বাহবা দিতে লাগল শ্রমিকরা। তাতে প্রেরণা পেয়ে আরও উন্মত্ত হয়ে উঠল সে। নাচের গতি বাড়িয়ে দিল।

'সারাটা দিন সবার চেয়ে বেশি খেটেছে ও,' বিড়বিড় করে বললেন ডুরেল, 'এখন এ রকম নাচাকোঁদা! এত শক্তি ও পায় কোথায়?'

'ও তো বলে পামপা দিয়েছে। ওর বয়েসে এই কাণ্ড, ভাবা যায় না!'

'কত বয়েস?'

কিছুটা অবাক হয়ে বন্ধু বললেন, 'ও, এখনও জানেন না! এই তো, আর দু'মাস গেলেই পঁচানব্বই পূর্ণ হবে।'

দশ

পশ্চিম আফ্রিকায় জঙ্গলের আরেক নাম বুশ। এই বুশ হয় দু'ধরনের। একটা হলো গ্রাম কিংবা শহরকে ঘিরে রাখা জঙ্গল, যেখানে মাঝে মাঝে চাষের খেত দেখা যায়, যেখানে নিরন্তর চলে শিকারিদের আনাগোনা। ক্রমাগত একটা ভীতির মধ্যে থাকতে থাকতে এ সব অঞ্চলের বুনো প্রাণীরা হয়ে যায় ভীষণ সতর্ক, ওদের দেখা পাওয়াই ভার হয়ে ওঠে। আর দ্বিতীয় বুশগুলো লোকালয় থেকে বহু মাইল দূরে, শিকারির যাতায়াত নেই বিশেষ, ফলে মানুষ সম্পর্কে একটা স্বাভাবিক ভয় থাকলেও ওখানকার জানোয়ারদের মধ্যে অতটা লুকোচুরি খেলার প্রবণতা নেই। এই বুশকে বলা হয় ব্ল্যাক বুশ। প্রকৃতিবিদ আর ফাঁদ পেতে যারা শিকার ধরে তাদের কাছে এই জঙ্গল একটা স্বর্গ।

অনেকের ধারণা, প্রচুর জানোয়ার আছে এমন বনের যেখানে ইচ্ছে ফাঁদ পেতে রাখলেই হলো, শিকার তাতে ধরা পড়বেই। ধারণাটা ভুল। সব সময় নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম-নীতি কঠোর ভাবে মেনে চলে বুনো জানোয়ার, নইলে ওদের টিকে থাকাই মুশকিল হয়ে যেত। ধরা যাক তৃণভোজী জানোয়ারের কথা। বছরের একটা বিশেষ সময়ে ওদের দেখা যাবে বনের এমন এক জায়গায় যেখানে ঘাস বেশি, বছরের অন্য সময়ে এ সব খাবার যখন কমে

যাবে, ওই অঞ্চলে আর দেখা যাবে না ওদের, সরে যাবে অন্যত্র। পানি খেতে আসবে রোজ একই জায়গায়। পানি না ফুরালে এর আর নড়চড় হবে না। কিছু কিছু জানোয়ার এমনকি প্রাকৃতিক কর্ম সারার জন্যেও একটা নির্দিষ্ট জায়গা বেছে নেয়, যেখানেই চরে বেড়াক, সময় হলে ঠিক ওই জায়গাটাতেই চলে যাবে।

বনের বিশেষ কোন জায়গায় দিনের পর দিন ফাঁদ পেতে রেখে দেখা গেল একটা জানোয়ারও ধরা পড়ছে না, মাত্র তিন-চার গজ ডানে বা বাঁয়ে সরাতেই একের পর এক ধরা পড়তে লাগল। এর কারণ জন্তু-জানোয়ারের এই নিয়ম মেনে চলা স্বভাব। যে পথে রোজ চলাচল করে ওরা, কোন রকম বাধা না পেলে সেখান দিয়েই চলবে, সামান্যতম এদিক ওদিক সরবে না। সুতরাং ধরতে হলে সেপথ খুঁজে বের করে ফাঁদ পাততে হবে।

যাই হোক, নানা প্রজাতির প্রচুর প্রাণীর বাস বলে এই ব্ল্যাক বুশের প্রতি প্রকৃতিবিদদের বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে। জেরাল্ড ডুরেলও এর ব্যতিক্রম নন। বেশ কয়েকবার গিয়েছেন তিনি ওসব জঙ্গলে জানোয়ার ধরার জন্যে।

এর জন্যে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছে তাঁকে। ক্যামেরুনের এক ব্ল্যাক বুশে ফাঁদ পেতে জানোয়ার ধরতে গিয়ে পর পর তিন হপ্তা কাটিয়েছেন শুধু ওরা কোন পথে চলাচল করে, সেটা বোঝার জন্যে। বনের মধ্যে লুকিয়ে থেকে নজর রেখেছেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা, সারাটা দিন ঠায় বসে থেকেছেন একই জায়গায়, নড়াচড়া বন্ধ। পরিশ্রম তো আছেই, এ কাজে প্রচুর ধৈর্যও দরকার।

কোথাও কোথাও ওখানে বনের মাটি বড় বিচিত্র। মাটির স্তর এত পাতলা, শেকড় বসাতে পারে না বড় গাছ, ফলে জন্মাতে পারে না। কয়েক হাত মাটির নিচেই পাথরের পুরু আস্তর। সেই পাতলা মাটিতে জন্মায় কেবল লম্বা ঘাস, আর ঘন ঝোপঝাড়। ডুরেলের ক্যাম্প থেকে মাইল তিনেক দূরে ওরকম একটা জায়গা ছিল পাঁচ একর জায়গা জুড়ে শুধুই ঘাস, রোদে পুড়ে প্রায় সাদা। সেই ঘাসবনকে মালার মত ঘিরে রেখেছে সরু এক চিলতে ঝোপঝাড়ে ছাওয়া জমি। ঝোপগুলোকে আবার ছেয়ে আছে পরজীবী লতা; নানা রকম বুনো ফুলের সমারোহ সেখানে। তার ঠিক পেছন থেকে শুরু হয়েছে প্রথমে ছোট গাছ, তারপর মাঝারি, এবং সবশেষে বিশাল বৃক্ষের বন, কোন কোনটা দেড়শো ফুট উঁচু স্তম্ভের মত সোজা হয়ে আকাশে মাথা তুলে আছে। জানোয়ার ধরা কিংবা পর্যবেক্ষণের জন্যে আদর্শ জায়গা ওটা।

খুব সকালে তাঁবু থেকে বেরোন ডুরেল। অত সকালেও সূর্য থাকে ভীষণ কড়া। কখনও ঘাসবন মাড়িয়ে কখনও বা কোণাকুণি পথ ধরে ঢুকে যান তিনি সবুজ বনের ভেতরে। গনগনে রোদ পেছনে ফেলে এই সবুজের ভেতরে ঢুকলেই একটা ধাক্কা খেতে হয়, ঝপ করে কয়েক ডিগ্রি নেমে যায় তাপমাত্রা। ডুরেলের মত আপনিও যদি সেই বনে ঢোকেন, মনে হবে বাইরের উত্তাপ থেকে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে ঢুকেছেন। মাথার ওপরে সবুজ পাতার ঘন চাঁদোয়া। মোটা মোটা ডাল যেন সযতনে ধরে রেখেছে বিশাল সেই চাঁদোয়াকে। পায়ের নিচে ঝরা পাতার পুরু কার্পেট, যেন পারস্য গালিচা।

লক্ষকোটি ঝিঁঝির ডাকে বাতাস যেন থরথর করে কাঁপে। সবুজ আর রূপালী রঙের সুন্দর সেই পোকাগুলো গাছের বাকল কামড়ে ধরে বসে থাকে। খুব বেশি কাছে যদি চলে যান, চোখের পলকে বাকল ছেড়ে দিয়ে ডানা মেলে বাতাসে ভেসে পড়বে খুদে বিমানের মত, ওদের স্বচ্ছ ডানায় সবুজ আলো চিকচিক করে তখন। বনের ভেতর হাঁটার সময় আপনাকে 'কে-ও! কে-ও!' বলে প্রশ্ন করবে একধরনের ছোট্ট পাখি। মুখ ফিরিয়ে তাকান, চোখে পড়বে না কিছুতেই। কোথায় যে লুকিয়ে আছে, বোঝা যাবে না। আবার হাঁটুন, আবার তরল গলায় প্রশ্ন আসবে, 'কে-ও!'

কোথাও কোথাও হঠাৎ চোখে পড়বে চাঁদোয়ার একটা অংশ গায়েব, মুখ তুলে তাকালে রোদজ্বলা উজ্জ্বল আকাশ চোখ ধাঁধিয়ে দেবে আপনার। বিশাল যে ডালটা ধরে রেখেছিল পাতাগুলোকে, সেটা গোড়া থেকে খসে পড়ে গেছে অতি খুদে এক ধরনের পোকার আক্রমণে। ডালের গোড়াটা কুরে কুরে খেয়ে ফোঁপরা করে ফেলেছিল পোকাগুলো। চাঁদোয়ার সেই ফোকর দিয়ে হলদে বর্শার মত বনতলে এসে পড়ে সোনালি রোদ। তার আশেপাশে উড়ে বেড়ায় বড় বড় প্রজাপতি। কি তাদের রঙের বাহার! ডানার লালচে-কমলা রঙ বনের আবছা অন্ধকারে মোমের আলোর মত ঝলকায়। পায়ের কাছ থেকে আচমকা লাফ দিয়ে শূন্যে উঠে যায় তুষার-সাদা প্রজাপতি, হালকা পালকের মত ভেসে থাকে বাতাসে, তারপর বোঁটা থেকে খসা পাতার মত দোল খেতে খেতে ধীরে ধীরে এসে নামে আবার পাতার গালিচায়।

হাঁটতে থাকুন। চোখে পড়বে একটা সরু ঝর্নার উঁচু পাড়। পাথরে পাথরে বাড়ি খেয়ে ফিসফিস কানাকানি করে নেচে নেচে চলে ঝর্নার টলটলে কাকচক্ষু পানির ধারা, বার বার চুমু খেয়ে যায় পাথরের গায়ে জন্মে থাকা সবুজ গুল্মকে, স্রোতের টানে খেলার ছলে কাত হয়ে হয়ে পড়ে যেন পানিতে জন্মে থাকা শর জাতীয় উদ্ভিদ। বনের বুক চিরে বয়ে গেছে এই নহর, গাছপালার ভেতর থেকে বেরিয়ে ঝোপঝাড়ওয়ালা জায়গাটাকে ভেদ করে, ঘাসবনকে দু'ভাগ করে দিয়ে ঢাল বেয়ে আবার বনের দিকে নেমে গেছে বেশ কিছু শাখা-প্রশাখা তৈরি করতে করতে। পাড়ে জন্মে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ হলুদ ফুল ওয়াইল্ড বেগোনিয়া।

প্রবল বর্ষণ মাটি ক্ষয় করে দিয়ে শেকড় বের করে ফেলেছিল এখানে বিশাল এক বৃক্ষের, গোড়া নরম হয়ে যাওয়ায় মাটি আঁকড়ে থাকা শেকড়ের ডগাগুলো আর ধরে রাখতে পারেনি গাছটাকে। বনের ভেতরে অর্ধেক, বাকি অর্ধেক শরীর ঘাসবনে রেখে এখন পড়ে আছে গাছটা। গায়ে বিরাট এক খোঁড়ল। গাছ মরে যাওয়ায় খোঁড়লটা ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে। নানা রকম লতা, গুল্ম আর ব্যাঙের ছাতা মহাসমারোহে বংশবৃদ্ধি করে চলেছে, ধরাশায়ী মহীরুহের বাকল খসিয়ে দেয়ার প্রতিযোগিতায় মেতেছে যেন।

গাছের ওই খোঁড়লটা ডুরেলের লুকানোর জায়গা। ওপরের বাকল খসে গিয়ে খোঁড়লের ভেতরটা নৌকার তলার মত হয়ে গেছে, তাতে ঢুকে বসে পড়লে, সামনের লতাপাতা বেশ চমৎকার পর্দার মত কাজ করে, বনে বিচরণকারী জানোয়ারের চোখে পড়ে না খোঁড়লের মানুষটাকে। আপনিও খুঁজে

বের করুন লুকানোর ওরকম কোন জায়গা। এ সব খোঁড়লে সাপ আর মারাত্মক বিষাক্ত কাঁকড়া বিছে আশ্রয় নেয় বলে প্রতিবার ঢোকার আগে ভাল করে দেখে নিতে হয় আপনার সঙ্গী হওয়ার জন্যে আরও কেউ ঘাপটি মেরে বসে আছে কিনা। গাছের খোঁড়ল না পেলে কোন বড় পাথর পেয়ে যাবেন, যার আড়ালে লুকিয়ে থাকতে পারবেন। তা-ও না পাওয়া গেলে ঝোপের ভেতর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন। মোটকথা, যেখানেই লুকান না কেন আপনি, এমন জায়গা বেছে নিতে হবে যাতে বুনো প্রাণীর চোখে না পড়েন। আরেকটা কথা, একেবারে চুপচাপ থাকতে হবে, নড়াচড়া যতটা সম্ভব কম।

বসার পরে একটা ঘণ্টা কিছুই ঘটবে না। কানে আসবে কেবল ঝিঁঝির একটানা চিৎকার। মাঝে মাঝে ঝর্নার তীর থেকে ক্রিক ক্রিক করে ডেকে উঠবে গেছো-ব্যাঙ, সামনে দিয়ে উড়ে যাবে হয়তো একআধটা নিঃসঙ্গ প্রজাপতি। মজার ব্যাপার হলো এখানে একঘেয়েমির শিকার হবেন না আপনি, নেশা ধরিয়ে যেন বুঁদ করে রাখবে আপনাকে এই আদিম বন। কোনমতে চুপচাপ থেকে যদি একটা ঘণ্টা পার করে দিতে পারেন, আপনিও হয়ে যাবেন ওই বনেরই একটা অংশ, যেমন হয়েছিলেন ডুরেল।

একঘণ্টা পর শুরু হবে বুনো প্রাণীর আনাগোনা। প্রথম আসবে ফলখেকো জায়ান্ট প্ল্যানটেইন-ইটার। বনের কিনারে জন্মে আছে অনেক বুনো ডুমুর গাছ। ম্যাগপাইয়ের মত ঝোলা লেজওয়ালা এই পাখিগুলো আসবে কর্কশ চিৎকার করে জানান দিতে দিতে। আধমাইল দূর থেকে শোনা যায় ওদের চিৎকার। ওড়ার সময় ডানা ঝাপটানোর তালে তালে ওপরে-নিচে দুলতে থাকে ওদের শরীর। গাছের ওপর এসে আচমকা ডানা গুটিয়ে নেবে, ঝুপ করে পড়বে গাছের ডালে। তারপর শুরু হবে ডুমুর খাওয়া চুপচাপ খেতে পারে না ওরা। ক্রমাগত চিৎকার করে আর ঝোলা লেজটা নাচায়, সোনালি-সবুজ পালকে রোদ লেগে ঝিক করে ওঠে। ডুমুর খেতে খেতে এক ডাল থেকে আরেক ডালে ঘুরে বেড়ায়, একে অন্যকে লক্ষ্য করে এমন ভঙ্গিতে লাফ দেয় যেটা মোটেও পাখিসুলভ নয়, বরং মনে হয় ক্যাঙারু। ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরে টান মেরে বোঁটা থেকে ডুমুর ছিঁড়ে নিয়ে কোঁৎ করে গিলে ফেলে।

ডুমুর গাছে এর পরের আগন্তুক একঝাঁক মোনা বানর লালচে লোম, ধূসর পা, আর লেজের গোড়ায় অদ্ভুত দুটো সাদা ছাপ থাকে এদের।

দলের বানরেরা ডুমুর খাওয়া শুরু করার আগে বনের কিনারে গাছের মগডালে পাহারা দিতে ওঠে ওদের সর্দার। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সামনের ঘাসবনের দিকে। ক্ষণিকের জন্যেও সন্দেহ দূর হয় না চোখ থেকে। থেকে থেকে খোঁত-খোঁত করে উঠে যেন অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ে লুকানো অদৃশ্য শত্রুকে উদ্দেশ্য করে। পেছনে গাছের ডালে স্থির হয়ে থাকে পঞ্চাশ কিংবা তারও বেশি বানর। ওই সময় অনভিজ্ঞ অতি খুদে দু'একটা বাচ্চা ছাড়া চিৎকার করার সাহস পায় না আর কেউ। বুড়ো সর্দার যখন সন্তুষ্ট হয় ঘাসবনের দিক থেকে কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই, ডাল ধরে গোড়ার দিকে হেঁটে যায় সে, শরীরটাকে ঢিল করে দিয়ে বসে পড়ে, লেজটা ঝুলে থাকে বড়

একটা প্রশ্নবোধক চিহ্নের মত, তারপর আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রচুর রসালো ফলওয়ালা একটা ডুমুর গাছের ডালে। এখানে এসে আরেকবার তাকায় ঘাসবনের দিকে। বিপদের সম্ভাবনা না থাকলে হাত বাড়িয়ে ছিঁড়ে নেয় প্রথম ডুমুরটা, হাঁক দেয়, অয়ঙ্ক! অয়ঙ্ক! অয়ঙ্ক! মুহূর্তে যেন ঝড় বয়ে যেতে থাকে ডালপাতায়। এডাল থেকে সেডালে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে থাকে বানরেরা, দাপাদাপি করে, ডুমুর খায়। একে অন্যের সঙ্গে ঝগড়া বাধায়। মায়ের পেটের নিচে থেকে চার হাতপায়ে পিঠ আঁকড়ে ধরে মাথা নিচু করে ঝুলে থাকে বাচ্চাগুলো। ওদেরকে ওই অবস্থায় নিয়েই লম্বা লম্বা লাফ মেরে এক গাছ থেকে আরেক গাছে চলে যায় মা। বাচ্চাগুলো নাকি স্বরে তীক্ষ্ণ চিৎকার করে ওঠে, ভয়ে, নাকি খেলার উত্তেজনায়, বোঝা মুশকিল।

কিছুক্ষণ দাপাদাপি করার পর শান্ত হয়ে আসে বানরের দল, চুপচাপ ডুমুর খেতে থাকে। এই সময় আচমকা বনের ভেতরে দমকা বাতাস বওয়ার মত আওয়াজ শোনা যাবে, সেই সঙ্গে পাতায় পাতায় ঘষা লাগার খসখস। ভাল করে কান পাতলে ওই শব্দের পেছনেও ডানা ঝাপটানোর আরেকটা ভারি হুপ-হুপ হুপ-হুপ শব্দ শোনা যাবে। এবং সবশেষে একটা বিচিত্র ডাক, শুনে মনে হবে ট্রাফিক জ্যামে পড়ে উত্তেজিত হয়ে বুঁউপ বুঁউপ করে হর্ন বাজাচ্ছে মোটরগাড়ির একদল মাতাল ড্রাইভার। যারা অভিজ্ঞ তারা বুঝবে হর্নবিলের ঝাঁক আসছে। বানরের সাড়া পেলেই ছুটে আসে এই পাখি তার কারণ, দাপাদাপি করে পাতা কিংবা ডালের আড়ালে লুকিয়ে থাকা গেছো-ব্যাঙ, গিরগিটি আর পোকামাকড়কে বের করে আনে বানরেরা। হর্নবিলেরা ডুমুরের সঙ্গে সঙ্গে এসব প্রাণীও ধরে খায়।

ডুমুর গাছের ওপরে এসেই বুঝে যায় পাখিগুলো, কোথায় আছে বানরের দল। ঝুপ-ঝুপ করে আকাশ থেকে নেমে এসে বসতে শুরু করে গাছের ডালে। ওদের বড় বড় গোল চোখে মাতালের দৃষ্টি, ঘন পাপড়িতে ঢাকা চোখের পাতা পুরো ফাঁক করে বানরদের দিকে তাকায় বোকা বোকা ভঙ্গিতে। শরীরের তুলনায় অস্বাভাবিক বড় আর ভারি ঠোঁটের ডগা দিয়ে আলগোছে ছিঁড়ে নেয় একটা ডুমুর। ওভাবে নিয়ে গিলতে পারে না বলে ওপর দিকে ছুঁড়ে দেয়, দুই ঠোঁট পুরো ফাঁক করে বিশাল হাঁ করে গলার কাছে লুফে নেয় ডুমুরটাকে, তারপর গিলে ফেলে কষ্ট করে খেতে হয় বলেই বোধহয় ওরা খাবার নষ্ট করে না। বানররা ঠিক এর উল্টো। একটা ফল ছিঁড়ে নিয়ে এক কামড়ের বেশি খায় না, ছুঁড়ে ফেলে দেয় মাটিতে, আরেকটা ছিঁড়তে হাত বাড়ায়।

এত গোলমাল পছন্দ করে না প্ল্যানটেইন-ইটাররা। বানর আর হর্নবিলেরা আসার সঙ্গে সঙ্গে সরে পড়ে। আধঘণ্টা পর গাছগুলোর নিচে আধখাওয়া ডুমুরে বিছিয়ে যায়। খাওয়া শেষ করে সন্তুষ্ট হয়ে অয়ঙ্ক অয়ঙ্ক ডাক ছাড়তে ছাড়তে আবার বনে ফিরে যায় বানরের দল। এরপর হর্নবিলেরাও দেরি করে না। আরও একআধটা ডুমুর গলায় পুরে ওরাও উড়ে চলে যায়, ঠাঁই করে দেয় পরবর্তী আগন্তুকদের জন্যে। এরপর যারা আসে তারা এতই ক্ষুদ্র আর ঘাসের ভেতর থেকে এত নিঃশব্দে বেরিয়ে আসে যে সঙ্গে যদি ফিল্ড-গ্লাস না থাকে

আপনার, আর পুরোপুরি সজাগ না থাকেন তাহলে কখন যে এল, টেরই পাবেন না। মনে হবে মাটি ফুঁড়ে বেরিয়েছে। এরা হলো ছোট জাতের ডোরাকাটা ইঁদুর, বাস করে লম্বা ঘাসের ভেতর, গাছের শেকড়ের ফোকরে, কিংবা বনের কিনারে পাথরের চাঙড়ের তলায়। ঘরের নেংটি ইঁদুরের সমান বড়, ক্রমশ সরু হয়ে যাওয়া লম্বা লেজ, হলদে-ধূসর ফোলানো রোম আর নাক থেকে লেজের গোড়া পর্যন্ত অনেকগুলো মাখন-সাদা ডোরাওয়ালা এই ইঁদুর ঘাসবনের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে হালকা পায়ে, থমকে দাঁড়ায়, এগোয়, আবার দাঁড়ায়, আবার এগোয়, এমনি করে অতি সতর্ক হয়ে চলে; যখন থামে, পেছনের পায়ে ভর দিয়ে বসে থাকে দীর্ঘক্ষণ কুঁজো হয়ে, গোলাপী রঙের খুদে থাবা সামনে বাড়িয়ে দিয়ে; নাক উঁচু করে বাতাসে শত্রুর গন্ধ শোঁকে। ঘাসের ভেতর যখন নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে যায়, একেবারে কাছে থাকলেও সহজে দেখা যায় না ওদের, গায়ের সাদা ডোরা ঘাসের রঙের সঙ্গে মিশে গিয়ে লুকিয়ে পড়তে সাহায্য করে।

খাওয়ার জায়গায় ঢোকার আগে ভালমত নিশ্চিত হয়ে নেয় ওরা, হর্নবিলেরা গেছে কিনা, পাখিদের চোখে পড়লেই পেটে চালান হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে। কোন শত্রুর গন্ধ না পেলে গুটি গুটি গিয়ে বসে পড়ে বানরদের ফেলে যাওয়া ডুমুরের কাছে, খাওয়া শুরু করে। অন্য জাতের ইঁদুরের সঙ্গে এদের স্বভাবের তফাৎ হলো, এরা খাওয়ার সময় চুপচাপ থাকতে পারে না, ঝগড়া বাধাবেই, নিচু গলায় কিঁচ কিঁচ করতে থাকবে। হয়তো দেখা যাবে একটা ডুমুরের দখল নিয়ে ঝগড়া বাধিয়েছে দুটো ইঁদুর। ছোট ছোট গোলাপী থাবা দিয়ে একটা আধখাওয়া ডুমুরকে দু'দিক থেকে খামচে ধরে টানছে নিজের দিকে। ডুমুরটা যদি অতিরিক্ত পাকা হয় তাহলে মাঝখান থেকে ফেঁড়ে গিয়ে দুই টুকরো হয়ে যাবে, হাস্যকর ভঙ্গিতে ডুমুরের একটা করে টুকরো আঁকড়ে ধরে চিত হয়ে পড়বে দু'জন দু'দিকে। দু'জনেই জিতল। উঠে বসে মাত্র ছয় ইঞ্চি তফাতে থেকে যার যার ভাগের খাবার চিবাতে শুরু করবে।

এ সময় কোন শব্দ যদি চমকে দেয়, সব ক'টা ইঁদুর খাড়া ওপর দিকে লাফিয়ে উঠবে, ছয় ইঞ্চি কিংবা তারও বেশি, যেন পেছনে লাগানো স্প্রিং ওপর দিকে ছুঁড়ে মেরেছে ওদের; ওভাবেই শরীরটাকে খাড়া রেখে পড়বে আবার মাটিতে, থরথর করে কাঁপতে থাকবে, চোখকান সজাগ, যতক্ষণ না বিপদ কেটে যায়। তারপর আবার শুরু হবে খাওয়া, ঝগড়া, খাবার নিয়ে মারামারি।

'একবার একটা করুণ ঘটনা ঘটতে দেখেছিলাম,' বলেছেন ডুরেল। 'খাবার নিয়ে মারামারি করছে ইঁদুরগুলো। বন থেকে বেরিয়ে এল একটা জেনেট। সম্ভবত এখানকার বনের সবচেয়ে সুন্দর জানোয়ার এটা। বেজির মত লম্বাটে শরীর, বিড়ালের মত মুখ, হলুদ শরীরে বড় বড় কালো ফোঁটা, লেজটাতে সাদাকালো আঙটি আঁকা। সকালের এ সময়টায় সাধারণত দেখা যায় না এদেরকে। সন্ধ্যায় কিংবা রাতের বেলায় শিকার করতে বেরোয়। এই বিশেষ জীবটা বোধহয় রাতে শিকার ধরতে পারেনি, পেটে খিদে, তাই দিনের

আলোতেই বেরিয়েছে। ঘাসবনের কিনারে বেরিয়ে ইঁদুরগুলোকে চোখে পড়া মাত্র পেটটাকে মাটিতে মিশিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল ওটা, তারপর নিশানা করে লাফ দিল, মনে হলো ক্ষণিকের জন্যে একটা হলুদ ঝিলিককে উড়ে যেতে দেখলাম। পরমুহূর্তে ইঁদুরগুলোর মাঝে গিয়ে পড়ল। স্প্রিঙের দম দেয়া পুতুলের মত লাফিয়ে শূন্যে উঠল ইঁদুরগুলো, মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দৌড় দিল ঘাসবনের দিকে। কিন্তু প্রাণ বাঁচিয়ে সবাই বনের নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছতে পারল না। দুটো নিথর ডোরাকাটা শরীরকে ঝুলতে দেখলাম জেনেটটার মুখে। ডুমুরের ভাগ নিয়ে কাড়াকাড়ি করছিল ওদুটো।

দুপুরের কড়া রোদের প্রচণ্ড উত্তাপে সমস্ত বন নীরব হয়ে যায়। সবাই যেন ঝিমোয়। এমনকি ঝিঁঝির একটানা কর্কশ ডাকের মধ্যেও কেমন একটা উদাস, ঝিমানো ভাব। এটা হলো প্রাণীদের দিবানিদ্রার সময়, খুব কম প্রাণীই বেরোয় তখন। ঘাসবনের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে একআধটা স্কিংক, রোদ ভালবাসে ওরা; ঘাসের ডগায় বসে থাকা ফড়িং বা গঙ্গাফড়িঙের লোভেও বেরোয়। এরা হলো একজাতের গিরগিটি। খুদে খুদে আঁশে ঢাকা, চেরি ফলের মত লাল আর মাখন ও কালো রঙের প্রলেপ দেয়া চামড়া দেখে মনে হয় এইমাত্র কাঁচা রঙ করা হয়েছে, যেমন গাঢ়, তেমনি ঝলমলে। ঘাসের ভেতর দিয়ে এত্তো তীব্র গতিতে ছুটে যায় এরা, রোদ ঝলকায় ওদের চামড়ায়, মনে হয় কোন ধরনের বাজি পোড়ানো হলো বুঝি। পশ্চিমে হেলে পড়া সূর্যের তেজ কমার আগে এই সরীসৃপেরা ছাড়া আর কোন প্রাণীর দেখা মেলে না, রোদ সহ্য করতে পারে না ওদের কেউই। সঙ্গে যদি খাবার নিয়ে এসে থাকেন, আর খেতে ইচ্ছে হয়, তাহলে খেয়ে নেয়ার এটাই উত্তম সুযোগ। সিগারেট টানতে ইচ্ছে করলে তাও টেনে নিতে পারেন।

এ সময়টায় একবার একটা মজার ঘটনা ঘটতে দেখেছেন ডুরেল। গাছের খোঁড়লে চুপচাপ বসে আছেন। দেখতে পেলেন তাঁর কাছ থেকে ছয় ফুট দূরে গাছের বাকল বেয়ে শম্বুক-গতিতে এগিয়ে আসছে একটা শামুক। শামুক শুনলেই মনে হয় বুঝি পানিতে বাস; পানিতে বাস করে বেশির ভাগ শামুক তাতে কোন সন্দেহ নেই, তবে ডাঙায়ও বাস আছে অনেক প্রজাতির শামুকের। এই স্থলচর কিংবা আরেকটু পরিষ্কার করে বললে বৃক্ষচর এই প্রাণীটা আপেলের সমান বড়। কি করে হাঁটছে ওটা, দূর থেকে বোঝা যাচ্ছে না, ডুরেল দেখছেন নিঃশব্দে দু'জনের মাঝের দূরত্বটা কমছে বড় ধীর গতিতে। ব্যাঙের ছাতা এড়িয়ে, গুল্ম মাড়িয়ে এগোচ্ছে ওটা। পেছনে রেখে আসছে চকচকে চিহ্ন, দেহ নিঃসরিত একধরনের তরল পদার্থ।

তাকিয়ে আছেন তিনি। হঠাৎ দেখলেন শামুকের ফেলে আসা চিহ্ন ধরে ধরে দ্রুত এগিয়ে আসছে আরেকটা প্রাণী। বলা হয় পশ্চিম আফ্রিকার ভয়ঙ্করতম রক্তপিপাসু শিকারি প্রাণী ওটা, অবশ্যই শরীরের তুলনায়। কারণ আকারে সিগারেটের চেয়ে বড় নয়, কুচকুচে কালো শরীর, লম্বা নাকটাকে হাউণ্ডের মত নিচু করে গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে এগোচ্ছে। এটা একজাতের ছুঁচো, শিকারি হিসেবে এবং দুঃসাহসে যার জুড়ি মেলা ভার, পেটে সারাক্ষণ খিদে

যেন লেগেই থাকে, যতই গিলুক, পেট আর যেন ভরতে চায় না। খাওয়ার জন্যেই যেন বেঁচে আছে। সুযোগ মত পেলে নিজের জাতভাইকে মেরে খেয়ে ফেলতেও দ্বিধা করে না। তীক্ষ্ণ কিঁচ কিঁচ করে আপনমনে কথা বলতে বলতে বিচিত্র ভঙ্গিতে শরীরটাকে এদিক ওদিক নাড়তে নাড়তে ছুটে এল ছুঁচো, ঝাঁপিয়ে পড়ল শামুকটার ওপর। ঝট করে খোলসের ভেতরে চলে গেল শামুকের মুখ। ছুঁচোর লম্বা নাকটা আটকে গেল ওর খোলা আর ঢাকনার ফাঁকে।

ভারি শামুকটা নাকে আটকে যাওয়াতে বিপদে পড়ে গেল ছুঁচো। গুঁতো মেরে খোলসের ভেতরে শামুকের নরম শরীরকে আঘাত করে ঢাকনা খোলাতে চাইল। পারল না। রাগে অন্ধ হয়ে গিয়ে শামুকটাকে গাছের গায়ে ঠেসে ধরে আরও জোরে চাপ দিল। এটার জন্যেও তৈরি আছে শামুকটা। সবজে-সাদা একধরনের ঘন আঠাল তরল পদার্থ বুদ্বুদ তুলে ছিটকে বেরিয়ে এল ওটার ঢাকনার ফাঁক দিয়ে, ছড়িয়ে দিল ছুঁচোর নাক আর মাথায়। জ্বালা করল নাকি ঝাঁঝাল গন্ধ লাগল ছুঁচোটার নাকে, বোঝা গেল না, তবে আক্রমণ করার ইচ্ছেটা দূর হয়ে গেল চোখের পলকে, নিজেকে বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে উঠল। খাওয়া দূরে থাক, নাক খোলাই এখন এক মহাসমস্যা। মরিয়া হয়ে এক ঝাঁকি দিয়ে নাক থেকে ছুটাল শামুকটাকে। গড়িয়ে পড়ে গাছের নিচে হারিয়ে গেল ওটা। পেছনের পায়ে ভর দিয়ে বসে থাবা তুলে নাকেমুখে লেগে থাকা জঘন্য আঠা মুছতে ব্যস্ত হলো। হা-হা করে হেসে উঠলেন ডুরেল। ঝট করে ফিরে তাকাল ছুঁচো। হাসির শব্দে ভয় পেয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল গাছ থেকে, ছুটে চলে গেল ঝোপের ভেতর।

দিবানিদ্রার সময় এ ধরনের ঘটনা অবশ্য অতি দুর্লভ, সচরাচর দেখতে পাওয়া যাবে না, আপনি অত্যন্ত ভাগ্যবান না হলে আপনার চোখে পড়বে না। যাই হোক, লোদের তাপ কমে গেলেই আবার আনাগোনা শুরু হবে প্রাণীদের, জ্যান্ত হয়ে উঠবে বন। ডুমুর গাছে নতুন মেহমানের আগমন ঘটবে, কাঠবিড়ালী। ওদের মধ্যে কম করে হলেও একটা জোড়া তো অন্তত থাকবেই যারা ডাল থেকে ডালে লাফিয়ে বেড়াবে, লুকোচুরি খেলবে, প্রেম করবে, তাড়া করে বেড়াবে একে অন্যকে, তারপর ক্লান্ত হয়ে এসে শরীর সহ লেজটাকে বাংলা ৯-এর মত করে বসে থাবা বাড়াবে ডুমুরের দিকে।

পশ্চিম দিগন্তে ঢলতে আরম্ভ করবে সূর্য, ছায়া বাড়বে বনতলে। ভাগ্য ভাল হলে দেখতে পাবেন কোন নিঃসঙ্গ হরিণীকে। ছোট জাতের অ্যান্টিলোপ হরিণ এরা, নাম ডুইকার। চকচকে হলুদ শরীর, পেন্সিলের মত সরু চোখা পা, সদাসতর্ক, সন্দিহান চোখে বনের গাছপালা আর ঝোপঝাড়ের দিকে লক্ষ রাখতে রাখতে এগিয়ে যাবে ঝর্নার দিকে। চলার পথে একাধিকবার থমকে দাঁড়িয়ে বড় বড় টলটলে চোখ মেলে দেখবে কোনখানে কোন বিপদ ঘাপটি মেরে আছে কিনা, সামনে পেছনে ঝটকা দিয়ে দিয়ে নড়তে থাকবে কান দুটো, আবিষ্কারের চেষ্টা করবে বিপদের অস্তিত্ব। নেচে নেচে চলা পানির লোভনীয় শব্দ যেন চুম্বকের মত টেনে নিয়ে যাবে হরিণীকে, আপনি দেখবেন আর

অবাক হয়ে ভাববেন এত নিঃশব্দে চলে কি করে এরা! হেঁটে নয়, যেন বাতাসে ভেসে চলেছে প্রাণীটা। চলার পথে হয়তো বিরক্ত করবে কোন উভচর ইঁদুরকে, জলে-ডাঙায় যার সমান গতিবিধি। ইঁদুর গোষ্ঠীর ছোট আকারের এই ধূসর প্রাণীগুলোর চেহারাটা কেমন বোকা বোকা, খচ্চরের কানের মত গোল আর বড় বড় কানগুলো দেখতে জানালার ঘোলা কাঁচের মত অর্ধস্বচ্ছ, পেছনের পা সামনের পায়ের চেয়ে অনেক বড় হয়ে গিয়ে অনেকটা ক্যাঙারুর রূপ দিয়েছে এদেরকে, অস্ট্রেলিয়ার থলেওয়ালা ওই বিচিত্র জীবগুলোর মতই বড় বড় লাফ দিতে পারে।

সন্ধ্যার আগে আগে গর্ত থেকে বেরোয় এই ইঁদুর। পানির কিনারে ঘুরে বেড়ায়। খাবারের সন্ধানে নেমে যায় অগভীর পানিতে, ডুব দিয়ে শ্যাওলার ফাঁকে ফাঁকে সাঁতার কেটে খুঁজে বেড়ায় জলজ পোকা, শিশু কাঁকড়া আর শামুক।

এ সময়ে আরও এক ধরনের ইঁদুর বেরোয়। শব্দ না করে থাকতে পারে না একটা মুহূর্ত। অকারণে ঝগড়া বাধায়, হই-চই করে। চার পায়ে ভর দিয়ে থাকার চেয়ে লেজ আর পেছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে বসতে পছন্দ করে বেশি। শরীরটা কালচে-সবুজ, নাক আর পেছনের অংশ বাদে, ওই দুটো জায়গা মরচে রঙের, মনে হয় লাল মুখোশ আর হাফপ্যান্ট পরে আছে। ওদের সবচেয়ে প্রিয় জায়গা হলো গাছের বড় বড় শেকড়ের গোড়ায় যেখানে ঝরা পাতা পুরু হয়ে জমে আছে। ওখানে ছোঁক ছোঁক করে বেড়ায় ওরা, হুটোপুটি করে, পাতার নিচে, শুকনো ডালের আড়ালে, পাথরের ফাঁকে খোঁজে পোকামাকড়। মাঝে মাঝে পেছনের পায়ে ভর দিয়ে মুখোমুখি বসে পড়ে, ভঙ্গি দেখে মনে হয় খাবারের সমস্যা নিয়ে জরুরী আলোচনায় বসেছে, লম্বা গোঁফ নেড়ে কিঁচ কিঁচ করে খুব দ্রুত কথা বলতে থাকে। কখনও বা ভীষণ উত্তেজিত হয়ে শেকড়ের গোড়ার নরম মাটি খুঁড়তে থাকে। চকলেট রঙের বড় কোন গোবরে পোকাকে কেউ পেয়ে গেলে আর রক্ষা নেই, খামচে বের করে এনে লড়াই বাধায় ওটার সঙ্গে। শক্ত খোলস আর শিংওয়ালা, শক্তিশালী এই পোকাগুলো গায়ে-গতরে ইঁদুরগুলোর সমানই। লড়াই করার ভঙ্গিটা বিচিত্র। আক্রান্ত হলেই শত্রুর দিকে পেছন করে বড় বড় কাঁটা বসানো পা দিয়ে লাথি মারার চেষ্টা করে। ইঁদুর চায় থাবা মেরে চিত করে ফেলতে। চিত হয়ে গেলে সহজে সোজা হতে পারে না আর এই পোকা। সুযোগ বুঝে ঝাঁপিয়ে পড়ে ইঁদুর। ধারাল দাঁতের গোটা দুই কামড়ই তখন গোবরেকে খতম করে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। তারপর শিকারকে দুই থাবায় জড়িয়ে ধরে পেছনের পায়ে ভর দিয়ে বসে শিকারি, খাওয়ার জন্যে তৈরি হয়। চিবায় আর আনন্দে কিঁচ কিঁচ করে, মুখে খাবার থাকায় জোরাল হয় না আওয়াজটা, কেমন ভোঁতা ভোঁতা।

ঘাসবনে তখনও আলো থাকে, কিন্তু বনের ভেতরে অন্ধকার হয়ে যায়, দেখতে কষ্ট হয়। এবারেও যদি আপনার ভাগ্য ভাল হয়, দু'চারটা নিশাচর জানোয়ারকে বেরোতে দেখবেন। ফোলা লেজ শজারুরা বেরোয় সবার আগে। কাঁটা ঝমঝম করে বনের মধ্যে খাবার খুঁজে বেড়ায়। ডুমুর গাছে আসে নতুন

অতিথি, কেউ ডাকে এদের গ্যালাগো, বলে, কেউ ডাকে বুশবেবি। যেন পরীর রাজ্য থেকে জাদুমন্ত্রের বলে এসে উদয় হয় ডুমুর গাছে, বড় বড় পিরিচের মত চোখ দিয়ে তাকিয়ে দেখে আশপাশের পৃথিবী, ভীতু ভঙ্গি দেখে মনে হয় এইমাত্র যেন আবিষ্কার করল দুনিয়াটা বড় বদখত জায়গা, এখানে টিকে থাকতে হলে সতর্কতায় মুহূর্তের ঢিল দিলে চলবে না। ডুমুর খেতে খেতে আচমকা বিরাট লাফ মেরে শূন্য থেকে ধরে উড়ুক্কু মথ। মাথার ওপরের আকাশে তখন ডুবন্ত সূর্যের নানা রঙের খেলা শুরু হয়ে গেছে। ধূসর টিয়ারা জোড়া বেঁধে উড়ে আসে গাছের ডালে বসে রাত কাটানোর জন্যে। শিস দেয় একে অন্যের উদ্দেশ্যে, হঠাৎ ক্যাঁচ-ক্যাঁচ করে তীক্ষ্ণ চিৎকার করে ওঠে, গাছে গাছে বাড়ি খেয়ে বহুদূরে ছড়িয়ে পড়ে সে-চিৎকার। তার জবাবে যেন দূরের বনে সমস্বরে বুনো চিৎকার করে ওঠে শিম্পাঞ্জী, পাগলের মত হাসে, গোধূলিবেলায় সে হাসি রোম খাড়া করে দেয় শরীরের।

যেমন নিঃশব্দে আসে তেমনি করেই গায়েব হয়ে যায় গ্যালাগোরা অন্ধকার হয়ে আসা আকাশের পটভূমিতে ডানা ঝাপটে তখন ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসে ফলখেকো বাদুড়, ঝুপঝাপ করে নামতে থাকে ডুমুর গাছে। দূর থেকে আরেকবার হাঁক দিয়ে সঙ্কেত জানায় শিম্পাঞ্জীরা, ঘুমোতে যাবে এবার। পুরো অন্ধকার হয়ে যায় বন, তাই বলে নীরব হয় না। খসখস, কিঁচ কিঁচ, ঘোঁৎ-ঘোঁৎ, হুটোপুটি চলতে থাকে আগের মতই, বরং দিনের চেয়ে আরও বেশি।

কিন্তু আপনি কিছুই দেখতে পাবেন না আর। সুতরাং খোঁড়ল ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হবে। এতক্ষণ একটানা বসে থেকে পা আড়ষ্ট হয়ে গেছে, রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়েছে, আবার স্বাভাবিক হতেই ঝিঁ-ঝিঁ ধরবে হয়তো। তাঁবুতে ফেরার জন্যে টর্চ জ্বালবেন। বিশাল বনের কালো অন্ধকারে সামান্য টর্চের আলো বড় অকিঞ্চিৎকর ঠেকবে। দৈত্যাকার গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে ভাববেন, এই কি তাহলে সেই ভয়াল রেইন ফরেস্ট, যার কথা এতদিন শুনে এসেছি! কোথায় ভয়? এ তো পরীর রাজ্য! অপরূপ এক মাতাল অরণ্য!

***